জানোয়ারের খেলা

শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী
প্রণীত

সন ১৩৩৭

পপুলার এজেন্সী
১৬৩, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
রামকুমার মেসিন প্রেস,
১৬৩, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

জানোয়ারের খেলা

পশুর প্রতিশোধ

[১]

সুরাটে একদল বেদে আসিয়া এক গাঁয়ের ধারে আড্ডা করিয়া বসিবার পরেই, হঠাৎ যখন সে অঞ্চলে চুরি আরম্ভ হইল, তখন সকলেই সেই বেদের দলটাকে সন্দেহ করিয়া, শুধু যে তাদের উপর নজর রাখিল এমন নয়, দলটাকে সেখান হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেও কসুর করিল না। তবুও বেদের দল নড়িল না বরং আরও যেন জাঁকাইয়া বসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

দলে পুরুষ ও মেয়ে মানুষ ছিল অনেকগুলি। মেয়েরা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া, বাঘের নখ, কুমীরের দাঁত, শুশুকের তেল, শূওরের চর্ব্বি প্রভৃতি নানা রকমের অদ্ভুত জিনিষ বেচিত এবং পুরুষেরা হাটে বাজারে বসিয়া জড়ি জাড়া দিত, ঝাড় ফুঁক করিত, মন্ত্র তন্ত্র শিখাইত, ভোজবাজী দেখাইত এবং কি যে না করিত তার ঠিকানা নাই। তাদের কারও কাছে পেঁটরা, কারও কাছে থলে, কারও সঙ্গে কাঠের সিন্দুক—এমনিতর এক একটা ভাণ্ডার

থাকিত। সেই সব ভাণ্ডারের ভিতরে, খুঁজিলে মিলিত না, এমন জিনিষ বোধ করি দুনিয়াতে নাই।

এ সব ছাড়াও সাপ ধরিয়া, ভূত ঝাড়াইয়া, লাঠি সোটা খেলিয়া, নাচ গান করিয়াও তারা যে রোজগারের চেষ্টা না করিত এমন নয়। সেই জন্য তাড়াইবার চেষ্টা করিলেও গাঁয়ের সাধারণ চাষাভূষো লোকেরা সুবিধা পাইলেই তাদের চারিদিকে ভিড় করিয়া জমিতে ছাড়িত না এবং বিস্তর মেয়ে মানুষ নানা রকমের ওষুধ পালা লইবার জন্য নিত্যই ছুটোছুটি করিতে বাকী রাখিত না।

বেদের দলের ভিতরে একটা মানুষ ছিল—অন্য সকলের চেয়ে সকল বিষয়েই ওস্তাদ বেশী। তার যেমন দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড চেহারা, গায়েও তেমনি অসুরের মতো জোর, মুখখানাও তেমনি ভয়ানক থম্‌থমে, আর চোখ দুটোও তেমনি রক্তবর্ণ—ঘোরালো। তার নাম—ঔগাঙ্গি।

ঔগাঙ্গি যে কোন্‌ দেশের মানুষ তা বুঝিবার উপায় ছিল না। কেহ বলিত পাঞ্জাবী, কেহ বলিত সাঁওতাল, কেহ বলিত তেলেঙ্গা, কেহ বলিত হাবসী, আবার কেহ বা বলিত কাফ্রী। সে যখন বেদের দলের সঙ্গে গাঁয়ে আসিয়া ঢুকিল, তখন তার চেহারা দেখিয়া গাঁয়ের সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া বলাবলি করিল—এ ব্যাটা ডাকাতের সর্দ্দার নিশ্চয়!

কিন্তু ঔগাঙ্গির দুর্নাম বেশী দিন রহিল না। দিন কতক পরেই, হঠাৎ এক রাত্রে একটা বস্তিতে আগুন লাগিয়া ভয়ানক

চীৎকার এবং হাহাকার উঠিল। সারা গাঁয়ের লোক বস্তির চারিদিকে ছুটিয়া গিয়া জড়ো হইল বটে, কিন্তু আগুন নিবাইবার চেয়ে গোলমালই করিতে লাগিল বেশী। দেখিতে দেখিতে দুই তিনটা বাড়ী দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া আগুন সমস্ত গাঁখানাকে ভস্ম করিতে ছুটিল।

সেই সময়ে হঠাৎ বেদের দল লইয়া ছুটিয়া আসিয়া ঠিক যেন ভেলকী দেখানোর মতো করিয়াই ঔগাঙ্গি এমন ভাবে চোখের পলকে গিয়া সেই জ্বলন্ত আগুনের ভিতরে ঝাঁপাইয়া পড়িল যে, লোকে বুঝিতেই পারিল না কেমন করিয়া কি হইল। তারপরে দেখিতে দেখিতে ঘণ্টা খানেকের ভিতরেই সে যেমন আগুন নিবাইয়া তার ভিতর হইতে বিজয়ী বীরের মতো দলবলের সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল, তখন সেই যমদূতের মতো কালি মাখা ভীষণ মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া গাঁয়ের লোকেরা বাহবা দিবে কি, ভয়ে ও বিস্ময়ে সকলের স্বর বন্ধ হইয়া গেল; অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল ফ্যাল ফ্যাল করিয়া।

কাহারও দিকে না তাকাইয়া ঔগাঙ্গি দলের লোকগুলিকে লইয়া নিঃশব্দে তাদের আড্ডার দিকে চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ এক বুড়ী পাগলের মতো ছুটিয়া গিয়া তাহার সামনে আছাড় খাইয়া পড়িয়াই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—'ওগো, আমার নাতনী যে ঘরে ঘুমোচ্ছিলো গো! তাকে যে বারকোরে আন্‌তে পারিনি গো! হায়, হায়, আমার কি সর্ব্বনাশ হলো গো বাবা!

গাঁয়ের জনকতক লোক ধম্‌কাইয়া উঠিল—“সারা গাঁ যে রক্ষা করেছে, এই আমাদের সাত পুরুষের ভাগ্যি, তা নয়, একটা পুঁচকে মেয়ের কথা তুলে হাউ হাউ কর্‌তে এসেছিস্ ? যা—যা—সোরে যা !”

আর জনকতক বলিল—“নিজের প্রাণের মায়ায় একলা উঠে পালিয়ে এয়েছিস্, আর বাচ্চা নাতনীটাকে তুলে আন্‌তে পারিস্‌নি ? এখন আর কাঁদলে হবে কি ? সে কি আর এতক্ষণে আছে যে পাবি ?”

বুড়ী জবাব না করিয়া আরও বেশী ছট্‌ফট্ ও হাহাকার করিতে লাগিল। ঔগাঙ্গি থম্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া দলের লোকদের দিকে চাহিয়া একবার নিজেদের ভাষায় কি বলাবলি করিল, তারপরে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল সেই পোড়া ঘরগুলোর দিক্ জন দুই বেদে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল—“তোর নাতনী কোন ঘরে মায়ি ?”

কাঁদিতে কাঁদিতে বুড়ী যে কি বলিল বেদেরা বুঝিতে পারিল না ! আগুন নিবিয়া গেলেও, তখন পর্য্যন্ত অনেক জায়গাতেই ধোঁয়ার সঙ্গে এমন গরম ভাব উঠিতেছিল যে, তার ভিতরে যাওয়া সহজ ছিল না। বুড়ীর কথা বুঝিতে না পারিলেও, ঔগাঙ্গি আর দেরী করিতে পারিল না। আবার দলের লোকগুলিকে লইয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া ঢুকিল সেই অনিবন্ত ঘরগুলোর ভিতরে।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে, ঔগাঙ্গি একটা আধ পোড়া মেয়েকে বাহির করিয়া আনিয়া সেইখানে শোয়াইয়া দিল। সকলে

আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে, বেদেগুলোর সঙ্গে সঙ্গে ঔগাঙ্গির কালিমাখা সমস্ত শরীর ঠিক যেন ঝল্‌সাইয়া সিদ্ধ হইয়া গেছে!

মেয়েটাকে দেখিয়াই গাঁয়ের সকলে বলিয়া উঠিল—"ইস্‌ মেয়েটা কোন কালে শেষ হয়ে গেছে। ওর জন্যে শুধু শুধু লোকগুলোকে পুড়িয়ে মার্‌লে!"

সেই কথা শুনিয়া মড়া-কান্না তুলিয়া বুড়ী পোড়া নাতনীকে জড়াইয়া ধরিতে গেল। তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া ঔগাঙ্গি বলিল—"না মায়ি মরেনি, কাঁদিস্‌ না। কিন্তু তুই নিয়ে তো বাঁচাতে পারবিনি। বলিস যদি তো আমরা ওকে নিয়ে গিয়ে একবার চেষ্টা কোরে দেখি?"

বুড়ী তখনি স্বীকার করিল। ঔগাঙ্গি আবার মেয়েটাকে সাবধানে তুলিয়া লইয়া তার লোকজনের সঙ্গে নিজেদের আড্ডাতে চলিয়া গেল। বুড়ীও ছুটিল তাহাদের পিছনে পিছনে।

একজন বেদে বাধা দিয়া বলিল—"না মায়ি, আজ তুই যেতে পাবি না। আমরা মন্তর-তন্তর ঝাঁড়-ফুঁক কোরবো, সে তোর সাম্‌নে হবে না। কাল সকালে আমাদের আড্ডাতে গিয়ে তোর নাতনীকে দেখে আসিস।"

বুড়ী আর যাইতে পারিল না। মেয়েটাকে লইয়া বেদেরা চলিয়া গেল। তখন গাঁয়ের লোকেরা আবার বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—"ব্যাটারা এসে বাহাদুরি দেখিয়ে আগুন নিবিয়ে দিয়ে গেল বটে, কিন্তু ওই কেলে ফাঁকি দিয়ে মেয়েটাকে খাবে বলে নিয়ে গেল। তুই দিলি কেন বুড়ী!"

সেই কথায় বুড়ী আবার আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তখন গাঁয়ের জন কতক লোক এক সঙ্গে মিলিয়া পরামর্শ করিল যে, সকলে জোট বাঁধিয়া একসঙ্গে বেদের আড্ডাতে গিয়া মরা মেয়েটাকে কাড়িয়া লইয়া আসিবে। বেদেরা বাধা দিলে পুলিশ লইয়া গিয়া তাহাদিগকে ধরাইয়া দিতে ছাড়িবে না।

কিন্তু, যাহাদের ঘর পুড়িয়াছিল তাহারা তাহা লইয়াই ব্যস্ত ছিল বলিয়া, সকলে একসঙ্গে মিলিয়া সে সময়ে বেদেদের আড্ডাতে যাইবার সময় পাইল না। শেষে অনেক যুক্তি-পরামর্শের পরে গাঁয়ের প্রায় অর্দ্ধেক মাথা গোছের মানুষ, যখন এক সঙ্গে মিলিয়া হৈ-হৈ করিতে করিতে বাহির হইল, তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

বেদেদের আড্ডার কাছাকাছি গিয়া কিন্তু সকলেই থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে, বুড়ীর নাতনীর সর্ব্বাঙ্গে কি মাখাইয়া বেদেরা একটা পরিষ্কার জায়গায় শোয়াইয়া রাখিয়াছে। তার এক পাশে বসিয়া ঔগাঙ্গি একমনে মধুর স্বরে একটা বাঁশী বাজাইতেছে এবং অন্য পাশে বেদেদের মেয়েরা হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া গাহিতে গাহিতে তালে তালে চমৎকার নাচিতেছে। তাদের মাঝখানে মেয়েটার ঠিক মাথার কাছে বসিয়া এক বুড়ো বেদে বিড়-বিড় করিয়া কি মন্ত্র পড়িতে পড়িতে, ক্রমাগতই তার গায়ের উপরে নানা ভঙ্গীতে নিজের দু'হাত নাড়িতেছে এবং মাঝে মাঝে ফুঁ দিতেও বাকী রাখিতেছে না।

সেই ব্যাপার দেখিয়া গাঁয়ের লোকদের আর আগাইয়া যাইতে ভরসা হইল না, সেইখানেই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া সেই দিকে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

[২]

সকাল হইবার সঙ্গে সঙ্গে বেদেদের নাচগান বন্ধ হইল, ঔগাঙ্গির বাঁশীও থামিল। বুড়ো বেদে আহ্লাদে হাসিয়া উঠিয়া গেল এবং বেদেনীরা মেয়েটিকে ঘিরিয়া সেবা করিতে বসিল। সেই সময়ে বুড়ীও চেঁচাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গাঁয়ের লোকদের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তখন বেদেদের নজর পড়িল সেই দিকে। তাহারা হাতছানি দিয়া সকলকে কাছে যাইতে ডাকিল। বুড়ীকে লইয়া গাঁয়ের লোকেরা আড্ডার সামনে গিয়া দাঁড়াইতেই ঔগাঙ্গি বলিয়া উঠিল—

"এই দেখ মায়ি, তোর নাতনী বেঁচে উঠেছে, কিন্তু ও এখনো চোল্‌তে নারবে, ওকে কোলে কোরে ঘরে নিয়ে যা। এমনি কোরে শুইয়ে রাখতে হবে, আর দুধ খেতে দিবি।"

"আর এই দাওয়াইটা রোজ সকাল-বিকাল ওর সারা গায়ে মাখিয়ে দিবি। হুঁসিয়ার, চোট লাগেনা যেন কোন জায়গায়।"

এই বলিয়া বুড়ো বেদে একটা নারিকেলের মালায় করিয়া পাতলা কাদার মতো একমালা প্রলেপের ঔষধ আনিয়া বুড়ীর হাতে দিয়া শেষে বলিল—"ফুরিয়ে গেলে আবার এসে দাওয়াই

নিয়ে যাস্। ভয় করিস্ না, পাঁচ-সাত দিনে, তোর নাতনী আরাম হোয়ে যাবে।”

বেদেদের উপরে আর কাহারও রাঁগ বা সন্দেহ রহিল না, বরং সকলেই তাহাদের ঔষধ এবং আশ্চর্য্য মন্ত্রশক্তির কথা গল্প করিতে করিতে মেয়েটিকে লইয়া চলিয়া গেল। সেই হইতে তাহাদিগকে তাড়াইবার চেষ্টা করা দূরে থাকুক, গাঁয়ের সাধারণ চাষাভূষোর দল—তাহাদিগকে সহায় ভাবিয়া—তাহাদের আড্ডায় সর্ব্বদাই যাওয়া-আসা এবং মেলা-মেশা করিতে স্থরু করিয়া দিল। কিন্তু গ্রামের বড় মানুষ ও মান্যগণ্য লোকদের মন ফিরিল না।

দিন কতক পরে নদীর ঘাটের কাছে একটা কুমীর ভাসিতে দেখিয়া জমীদারের পাকেরা ছুটিয়া গিয়া তাহাদের মনিবকে সংবাদ দিল। বাবুরা তখনি বন্দুক লইয়া আসিয়া কুমীরটাকে মারিবার অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পাচ সাতবার গুলি করিয়াও কুমীরের কিছুই করিতে পারিলেন না। শেষের গুলিটা তার পিঠ ঘেঁষিয়া চলিয়া গেল। কুমীরও সঙ্গে সঙ্গে জলে ডুবিয়া অদৃশ্য হইল।

পরদিন কুমীর আবার ভাসিল। তাহাকে মারিবার চেষ্টাও চলিল। আগের দিনের মতো এমনি করিয়া পাঁচ-সাত দিন পর্য্যন্ত শিকারীর দল ক্রমাগত হারিয়া শেষে হাল ছাড়িয়া দিল। কিন্তু, নিত্য বন্দুকের গুলির আওয়াজে কুমীরটা রাগিয়া সে জায়গা আর ছাড়িতে চাহিল না, বরং তার রোখ এমনি চড়িয়া গেল

যে, সে রোজই যখন তখন ঘাটের আশে-পাশে ওৎপাতিয়া ভাসিতে আরম্ভ করিল।

গ্রামের লোক ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল। তাহাদের নাহিতে কি জল আনিতে যাওয়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। মানুষের জল-কষ্টের সীমা রহিল না। জমীদার রটাইয়া দিলেন—"যে কুমীর মারিতে পারিবে তাঁকে একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে।"

পুরস্কারের লোভে অনেকে অনেক রকম চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুই ফল হইল না। শেষে কুমীরের উপদ্রব এমনি বাড়িল যে, লোকে আর গরু-বাছুর পর্য্যন্ত নদীর ধারে চরাইতে সাহস করিল না।

সেই সময়ে লোকের মুখে ঔগাঙ্গির শক্তির কথা শুনিয়া জমীদার তাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কুমীর মারিতে পারিবে?"

ঔগাঙ্গি জবাব করিল—"না হুজুর, জানোয়ার মারতে আমার ওস্তাদের মানা আছে—মার্‌তে পারবো না। কিন্তু আপনারা যদি ওর অনিষ্ট না করেন তা হোলে ওকে নদী থেকে সরিয়ে দিতে পারি।"

গ্রামের অনেকগুলি গণ্যমান্য বড় মানুষ আসিয়া সেইখানে জুটিয়াছিলেন। সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কুমীর জলের জানোয়ার, তাকে নদী থেকে সরিয়ে দেবে কেমন কোরে?"

ঔগাঙ্গি হাসিয়া বলিল—"আপনারা চোখেই দেখতে পাবেন। ওস্তাদের দয়ায, আমি কুমীরটাকে তুলে এনে পুষবো। তখন কিন্তু আপনারা আমার কাজে বাধা দিতে 'কি কুমীরের ওপোর কোন রকম অত্যাচার কর্‌তে পারবেন না।"

"কোথায় রেখে পুষবে?"

"কুমীরটা থাকতে পারে, এমন একটা বড় রকমের কাঠের চৌবাচ্চা আপনাদের তৈয়ারী করিয়ে দিতে হবে। তার তলায় চাকা দেওয়া থাকবে, যেখানে যখন ইচ্ছা—চৌবাচ্চাটাকে টেনে নিয়ে যেতে পারবো। এই যদি কড়ার করেন, তা হলে, তিন দিনের ভিতরে আমি কুমীরটাকে তুলে আনতে পারি।"

ঔগাঙ্গির কথা কেহই বিশ্বাস করিলেন না, তাঁহারা বলিলেন—"তুমি যদি কুমীরকে সত্যি তুলে আনতে পার, তা'হোলে আমরা প্রতিজ্ঞা করছি যে, তোমাকে একটা কাঠের চৌবাচ্চা করিয়ে দেব, আর কুমীরের ওপরেও কোন রকম অত্যাচার কোরবো না। কিন্তু আগে কুমীরকে তুলে এনে তোমার কথার প্রমাণ দেখাতে হবে।"

"বেশ, কাল থেকে তিন দিনের ভিতরে কুমীরকে তুলে আনবো। তখন যদি আপনারা কড়ার মতো কাজ না করেন, তা'হোলে কিন্তু আপনাদের অনিষ্ট হবে, তার জন্যে আমরা দায়ী হব না।"

এই বলিয়া ঔগাঙ্গি সেখান হইতে নদীর ধারে চলিয়া গেল। তাহার পিছনে পিছনে গ্রামের লোক ভিড় করিয়া ছুটিল। নদীর

তীরে গিয়া ঔগাঙ্গি সকলের দিকে ফিরিয়া আবার বলিল—"আপনারা তফাতে থাকবেন, জলের ধারে এসে ভিড় কোরবেন না, কি গোলমাল কোরবেন না।"

গ্রামের লোকেরা দূরে—নানা জায়গায়—ছড়াইয়া পড়িয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। কিন্তু নদীতে কোথাও কুমীরের চিহ্ন পর্য্যন্ত কেহ দেখিতে পাইল না।

ঔগাঙ্গি একলা হাতখানেক জলে নামিয়া—কি মন্ত্র পড়িতে পড়িতে বারকতক হাত দিয়া জল নাড়িল। তারপরে উঠিয়া আসিয়া ঘাটে বসিয়া নিজের মনে বাঁশী বাজাইতে সুরু করিল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর্য্যন্ত নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়াও গ্রামের লোকেরা কুমীর দেখিতে পাইল না। তাহারা অবিশ্বাস করিয়া বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল।

ঔগাঙ্গির কোন দিকে নজর ছিল না, জলের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া সে আপনার মনেই বাঁশী বাজাইতেছিল। হঠাৎ ঘাটের সোজা—নদীর ওপারে যেন একটা গাছের ডাল ভাসিয়া উঠিল। ক্রমেই ডালটা স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে সোজা কিছুদূর পর্য্যন্ত আগাইয়া যাইতে লাগিল।

সেইটার উপর নজর পড়িতেই ঔগাঙ্গিও হঠাৎ উৎসাহে মাতিয়া দ্বিগুণ জোরে বাঁশী বাজাইতে সুরু করিল। উপরে গ্রামের যাহারা তখন পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াছিল, তাহারাও সেই ব্যাপার দেখিয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া স্থির হইয়া রহিল।

স্রোতের মুখে ভাসিয়া যাইতে যাইতে গাছের ডালটা হঠাৎ বেগে উল্‌টা দিকে ফিরিল এবং বাঁশীর স্বরের সঙ্গে সঙ্গে উজান ঠেলিয়া ক্রমেই ঘাটের দিকে অতি ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া আগাইয়া আসিতে লাগিল। প্রায় কুড়ি মিনিট পরে, গ্রামের লোকেরা উপর হইতে সভয়ে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, ঘাটের কাছে প্রকাণ্ড একটা কুমীর মড়ার মতো স্থির হইয়া ভাসিতেছে।

আরও আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঔগাঙ্গি তেমনি ভাবেই বাঁশী বাজাইয়া হঠাৎ থামিল। তারপরে নিজের মনে কিছুক্ষণ বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িয়া আবার জোরে জোরে বাঁশীতে তিনবার ফুঁ দিয়া উপরে উঠিয়া আসিল এবং সন্ধ্যার পরে একটা পাঁঠা কিনিয়া লইয়া গিয়া ঘাটের ধারে খোঁটা পুতিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া আসিল।

রাতারাতি কথাটা গ্রামময় রটিয়া গিয়াছিল। সকাল হইবার সঙ্গে সঙ্গে সারা গাঁয়ের লোক ভাঙ্গিয়া নদীর পাড়ে গিয়া জমা হইল। কেহই কিন্তু কুমীর কি পাঁঠাটাকে দেখিতে পাইল না।

কিছু পরেই, ঔগাঙ্গির সঙ্গে বেদের দলের পুরুষ মেয়ে সকলেই নদীর ধারে আসিল। তারা কিন্তু, উপরে না দাঁড়াইয়া একেবারে নামিয়া গেল জলের কাছে। তখন সেই বুড়ো বেদে মন্ত্র পড়িতে পড়িতে তিনবার খুব জোরে জোরে জল নাড়িয়া দিল, তারপরে উঠিয়া আসিয়া এক জায়গায় পূজার উপকরণ সাজাইয়া বসিল। তাহাকে ঘিরিয়া এক দিকে মেয়েরা হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইল এবং অন্য দিকে একলা ঔগাঙ্গি স্থির হইয়া

দাঁড়াইল বাঁশী লইয়া, আর তাহাদের তিন দিকে অর্দ্ধচন্দ্রের মতো গোল হইয়া ঘিরিয়া নদীর দিকে মুখ করিয়া বেদের দলের অন্য সকলে দু'হাত জুড়িয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল।

প্রথমে সকলে এক সঙ্গে চেঁচাইয়া কি একটা মন্ত্র বলিয়া কপালে দু'হাত তুলিয়া—কে জানে কাহাকে প্রণাম করিল। তিনবার তেমনি করিবার পরে, ওঁগাঙ্গি সুরু করিল বাঁশী বাজাইতে। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরাও নাচ-গান আরম্ভ করিয়া দিল।

একবার নাচ-গান থামিতে বুড়ো বেদে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নদীর জলে কতকগুলি ফুল ছুঁড়িয়া দিয়া বসিল। তখন আবার বাঁশীর সুরের সঙ্গে নাচ-গান আরম্ভ হইল। গ্রামের লোকেরা উপরে দাঁড়াইয়া বেদেদের পূজার ব্যাপার দেখিতে লাগিল, কিন্তু কুমীর যে কোথায়, তাহা কেহই ঠিক করিতে পারিল না।

বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বেদেদের পূজার ঘটাও বাড়িয়া উঠিল। বাঁশীর সুরের সঙ্গে মেয়েদের মধুর গান মিশিয়া আকাশ বাতাস ভরাইয়া দিল। হঠাৎ সেই সময়ে তাহাদের কাছে ভুস্ করিয়া আবার সেই কুমীর ভাসিয়া উঠিল।

বেদেরা সকলেই এক সঙ্গে আহ্লাদে চেঁচাইয়া উঠিয়াই এবার মাটীতে মাথা ঠুকিয়া প্রণাম করিল। তারপরে আবার আরম্ভ করিল তেমনি নাচ-গান। মাঝে মাঝে বুড়ো বেদে কুমীরের কাছে কি যে ছুড়িয়া দিতে লাগিল গ্রামের লোকেরা তাহা বুঝিতে পারিল না। কিন্তু সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল

যে কুমীরটা ঠিক এক জায়গাতেই—মড়ার মতো স্থির হইয়া ভাসিয়া রহিল, একটুও নড়িল না কোন দিকে।

শেষে প্রায় তিন ঘণ্টা পরে পূজা শেষ করিয়া বেদের দল উপরে উঠিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে কুমীরটাও—ভাসিতে ভাসিতে ওপারের দিকে চলিয়া গিয়া নদীতে ডুবিয়া গেল।

উপরি উপরি তিন দিন বেদের দলের সকলে নদীর ধারে গিয়া সেইভাবে পূজা করিল। কুমীরটাও তেমনি করিয়া ভাসিতে লাগিল। শেষ দিনের পূজা শেষ করিয়া বেদের দল আড্ডাতে চলিয়া গেল। ঔগাঙ্গি কিন্তু সে দিন আর তাহাদের সঙ্গে না গিয়া ঘাটে বসিয়া একলা বাঁশী বাজাইতে লাগিল। কুমীরও সে দিন আর ডুবিল না, তাহার কাছেই স্থির হইয়া ভাসিয়া রহিল।

ক্রমে, একটু একটু করিয়া ঔগাঙ্গি তাহার বাঁশীতে এক সুর বদলাইয়া অন্য সুর বাজাইতে সুরু করিল। কুমীরও তেমনি একটু একটু করিয়া ক্রমেই তাহার কাছে আসিতে লাগিল। ঔগাঙ্গি আহ্লাদে আবার অন্য সুর আরম্ভ করিল। কুমীর আর কিছুতেই তফাতে থাকিতে পারিল না, একেবারে জলের ধারে আসিয়া লম্বা মুখ খানা তুলিয়া দিল ডাঙ্গার উপর।

ঔগাঙ্গি সারা মন প্রাণ ঢালিয়া বাঁশী বাজাইতে লাগিল। কুমীরও অর্দ্ধেক জলে এবং অর্দ্ধেক তীরের উপরে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল নিঝুম হইয়া।

ঘণ্টা খানেক পরে তেমনি বাঁশী বাজাইতে বাজাইতেই ঔগাঙ্গি পিছনে পিছনে হাঁটিতে হাঁটিতে উপরে উঠিতে লাগিল। সঙ্গে

সঙ্গে কুমীরও উঠিতে লাগিল জল হইতে তীরের উপরে। ক্রমে ঐগাঙ্গি ঘাটের পথ ধরিয়া উপরের রাস্তায় আসিয়া উঠিল। কুমীরও আসিতে লাগিল সঙ্গে সঙ্গে।

উপরে উঠিয়া বাঁশী বাজাইতে বাজাইতেই ঐগাঙ্গি ফিরিয়া ধীরে ধীরে নিজেদের আড্ডার দিকে আগাইয়া চলিল, আর কুমীরও ঠিক পোষা খেজীর মতো বাঁশীর সুরে বিভোর হইয়া সুড় সুড় করিয়া চলিতে লাগিল তাহার পিছনে পিছনে।

সারা গাঁয়ের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িয়া সেই ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। এক হাতে ইসারা করিয়া ঐগাঙ্গি তাহাদের চলিয়া যাইতে বলিল। প্রকাণ্ড কুমীরের বিকট চেহারা দেখিয়া গ্রামের লোক আগে আগে পথ ছাড়িয়া সরিয়া যাইতে লাগিল। ঐগাঙ্গিও সমান ভাবে বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে কুমীরটাকে লইয়া গেল তাহাদের আড্ডাতে।

বেদেদের আড্ডার পিছনে একটা মরা খাল ছিল। ঐগাঙ্গি কুমীরটাকে লইয়া গিয়া রাখিল সেই খালের ভিতরে। মাস খানেকের ভিতরে সারাগ্রামের লোক আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে, ঐগাঙ্গি কুমীরটাকে বশ করিয়া কুকুরের মতো সঙ্গে লইয়া খেলা করিতেছে। তখন জমীদার তাহাকে একটা প্রকাণ্ড চাকা দেওয়া কাঠের চৌবাচ্চা তৈয়ারী করাইয়া দিল।

মাস ছয় পর্য্যন্ত ঐগাঙ্গি চৌবাচ্চা ঠেলিয়া আশ-পাশের নানা গ্রামে গ্রামে লইয়া গিয়া কুমীরের খেলা দেখাইয়া কিছু কিছু

উপার্জ্জন করিতে লাগিল। চারিদিকে তাহার আশ্চর্য্য শক্তির কথা রটিয়া যাইতেও বাকী থাকিল না।

সেই সময়ে এক সাহেব একটা পোষা সিংহীকে লইয়া খেলা দেখাইবার জন্য সহরে আসিয়া তাঁবু ফেলিলেন। সাহেবের সঙ্গে আফ্রিকা দেশের একজন চাকর ছাড়া অন্য লোক ছিল না। সেই চাকরটাই সিংহীর সঙ্গে খেলিত। কিন্তু যে দিন লোকের ভিড় বেশী হইত,কি কোন বড় মানুষের বাড়ীতে খেলা দেখাইবার বায়না থাকিত সে দিন সাহেব নিজেই খেলা দেখাইতেন সিংহীর খাঁচায় ঢুকিয়া।

দেখিতে দেখিতে সহরে সাহেবের পশার খুব জমিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রোজগারও হইতে লাগিল যথেষ্ট। তাহা শুনিয়া ঔগাঙ্গিও তাহার কুমীর লইয়া খেলা দেখাইবার জন্য সেই খানে আসিয়া সাহেবের তাঁবুর পাশেই বসিয়া গেল। তাহাতেই দুইজনে বিষম ঝগড়ার সূচনা হইল।

সার্কাসে বাঘ ও সিংহের খেলা লোকে আরও দেখিয়াছিল, কিন্তু যমের দোসর প্রকাণ্ড কুমীর লইয়া খেলার কথা কেহ কখনও দেখে নাই কিম্বা সম্ভব বলিয়া ভাবিতে পারে নাই। তাই ঔগাঙ্গি যখন তাহার কুমীরের খেলা দেখাইতে সুরু করিল, তখন সমস্ত সহর জুড়িয়া বিষম হৈ হৈ পড়িয়া যাইতে দেরী হইল না। তার উপর, সাহেবের সিংহীর খেলার চেয়ে, ঔগাঙ্গির কুমীরের খেলার টিকিটের দাম ঢের কম ছিল বলিয়া, কুমীরের খেলা দেখিতেই নিত্য লোকের ভিড় জমিতে লাগিল বেশী। সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের রোজগারও অর্দ্ধেক কমিয়া গেল।

তখন সাহেব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। একটা তুচ্ছ ছোট লোক যে ঠিক তাঁহার বুকের উপর বসিয়াই—তাঁহার রোজগারের পথ বন্ধ করিবে তা' তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। কাফ্রী চাকরটাকে পাঠাইলেন, ঔগাঙ্গির সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করিবার জন্য। খেলার পরে লোকের ভিড় কমিয়া গেলে কাফ্রীটা ঔগাঙ্গির হোগ্‌লার ঘরে গিয়া তাহাকে তাহাদের সঙ্গে মিশিবার জন্য বলিল। ঔগাঙ্গিও ভাবিয়া জবাব দিল—"রোজগারের অর্দ্ধেক টাকা তাকে দিলে সে সাহেবের সঙ্গে মিশিয়া কুমীর এবং সেই সঙ্গে সাপের খেলাও দেখাইতে রাজি আছে।"

কিন্তু সাহেব ঔগাঙ্গিকে রোজগারের সিকির বেশী কিছুতেই দিতে চাহিলেন না, বরং আরও জানাইয়া দিলেন যে, এ সহর ছাড়িয়া অন্য সহরে গেলে ঔগাঙ্গিকে তখন দু' আনার বেশী দিবেন না।

ঔগাঙ্গি রাজি হইল না—হাসিয়া বলিল—"দোস্ত, তোমার সাহেবকে বোলো যে, গরজ আমার নয়, গরজ তাঁরই বেশী। তিনিই তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়ে বন্দোবস্ত কোর্‌তে চাইছেন। চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছ তো, কে কত বেশী রোজগার করছে? এ ছেড়ে কি জন্যে আমি তাঁর সঙ্গে জুট্‌তে যাব? তবু তিনি সাহেব-মানুষ বলে, তাঁর খাতির রাখবার জন্যে আমি অর্দ্ধেক বখরাতে রাজি হয়েছি। তার কমে আমি যাব না।"

কাফ্রী একেবারেই রেগে উঠে শাসিয়ে বোল্‌লে—"তুই ছোটলোক হয়ে কার সঙ্গে ঝগড়া করতে যাচ্ছিস তা

জানিস? সাহেবের সঙ্গে না জুট্‌লে তুই ক'দিন এখানে থাক্‌তে পারবি?"

ঔগাঙ্গি জবাব কোরলে—"আমি ছোটলোক মান্‌ছি, কিন্তু এই ব্যবসায়ের হিসাবে তাতে আর আমাতে তফাত কি? ঝগড়া তো আমি কর্‌ছি না, তোমরাই গায়ে পোড়ে লাগতে এসেছ আমার সঙ্গে। কিন্তু ছোটলোক হলেও আমিই টিকে থাকবো এখানে। তোমাদের যা রোজগার দেখ্‌ছি, তাতে শীগ্‌গির সরে পোড়তে হবে তোমাদেরই।"

কথা কহিতে কহিতে দুইজনেই ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঔগাঙ্গির কথা শুনিয়া কাফ্রীটা আর রাগ বরদাস্ত করিতে পারিল না। অচম্‌কা বাঘের মতো গর্জ্জন করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল গিয়া ঔগাঙ্গির উপরে।

তখনো লোকের ভিড় একেবারে কমে নাই। বিস্তর লোক হৈ হৈ করিয়া চারিদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ঔগাঙ্গি তৈয়ার ছিল না, কাফ্রীটা ঝাঁপাইয়া তাহার উপর পড়িতেই তাহাকে শুদ্ধ লইয়া সে মাটীতে পড়িয়া গেল। কিন্তু, পরক্ষণে উঠিয়াই সরিয়া দাঁড়াইল তফাতে। কাফ্রী আবার বিষম ঘুষি তুলিয়া মারিতে গেল তাহার মুখে। ঔগাঙ্গি অমনি তাহার ঘুষো লুফিয়া, চোখের পলকে তাহাকে ধরিয়া—শূন্যে তুলিয়া—দশহাত দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। যাহারা দেখিতেছিল, তাহারা একসঙ্গে হাততালি দিয়া ঠাট্টা করিয়া উঠিল।

কাফ্রীটা অতি কষ্টে গা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু

বিষম লজ্জা পাইয়া আর ঔগাঙ্গির দিকে ঘেঁসিল না, মাথা নীচু করিয়া চলিয়া গেল নিজেদের তাঁবুতে।

ঘণ্টা দুই পরে ঔগাঙ্গি শুইতে যাইতেছিল, হঠাৎ সাহেব রাগে লাল হইয়া কাফ্রীর সঙ্গে আসিয়া জোর করিয়া তাহার ঘরে ঢুকিলেন এবং দু'জনে মিলিয়া ঘুষা লাথি এবং চাবুক মারিয়া ঔগাঙ্গিকে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

বেদের দলের আড্ডা পড়িয়াছিল খানিকটা তফাতে মাঠের ধারে। লোকের হৈ হৈ শুনিয়া, তাহারা ছুটিয়া আসিয়া ঔগাঙ্গিকে ধরিয়া তুলিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তে লাল হইয়া জায়গায় জায়গায় বিষম ফুলিয়া উঠিয়াছিল। বুড়ো বেদে ছুটিয়া গিয়া প্রলেপ আনিয়া তাহাকে মাখাইল। তারপরে জিজ্ঞাসা করিল—ব্যাপার কি?

প্রলেপের গুণে ঔগাঙ্গি অনেক সুস্থ হইয়াছিল, একে একে সে সকল কথা জানাইল। বেদের দল শুনিয়া খানিক ভাবিয়া কহিল—"কাজ নেই আর আমাদের রোজগারে, সাহেবদের হাজার অন্যায় হোলেও কেউ তা অন্যায় বোল্‌বে না। মিনি দোষে দোষী করবে আমাদেরই। তার চেয়ে, এখান থেকে চল আমরা চোলে যাই।"

বারুদের মতো জ্বলিয়া উঠিয়া ঔগাঙ্গি বলিল—"হুঁ যাব, কিন্তু বেইমান শয়তান দু'জনকে শিক্ষা দিয়ে যাব। তোরা সব চোলে যেয়ে আড্ডা তোলবার বন্দোবস্ত কর গিয়ে। থাক্‌তে হবে বড় জোর কালকের রাতটা পর্য্যন্ত।"

বেদেরা চলিয়া গেলে, ঔগাঙ্গি সেইখানে বসিয়া তার বাঁশী লইয়া বাজাইতে সুরু করিল। সন্ধ্যার খেলা দেখাইবার পর হইতে কুমীরের চৌবাচ্চাটা ঘরের একধারে তেমনি পড়িয়া ছিল। তাহার একদিকে চওড়া পাটাতনের একটা সিঁড়ি লাগানো ছিল। চৌবাচ্চার জল কানায় কানায় ভরিয়া কাচের মতো ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। তারই পাশে একটা কেরোসিনের বাতি আলো দিতেছিল মিট্‌মিট্ করিয়া।

প্রায় পনেরো মিনিট পরে চৌবাচ্চার স্থির জল অস্থির করিয়া দুইটা লম্বা লম্বা ঠোঁট উপরে ভাসিয়া উঠিল। বাতির ক্ষীণ আলোতে তাহার দুই সারি তীক্ষ্ণ দাঁত ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে জল তোলপাড় করিয়া কুমীরটাও সুমুখের পা দুটো পাটাতনের সিঁড়ির উপরে দিয়া মিনিটখানেক স্থির হইয়া রহিল। তাহা দেখিয়া ঔগাঙ্গির বাঁশীও বাজিতে লাগিল অতি করুণ সুরে।

কুমীর আর থাকিতে পারিল না, সুড় সুড় করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া ঔগাঙ্গির কাছে গিয়া ঠোঁট শুদ্ধ লম্বা মুখখানাকে রাখিল তার কোলের উপর।

ঔগাঙ্গি বাঁশী থামাইয়া একবার কান পাতিয়া শুনিল। রাত দু'পর কাটিয়া গিয়াছিল। কোথাও কিছুমাত্র সাড়া শব্দ ছিল না। ঔগাঙ্গি কুমীরের মাথায় আদর করিয়া হাত বুলাইতে বুলাইতে বিড় বিড় করিয়া কি বলিল। কুমীরটা একবার মুখ উঁচু করিয়া একটা লম্বা হাই তুলিল। তখন ঔগাঙ্গি—চোরের মতো—

নিসাড়ে ঘরের বাহির হইল। কুমীরও তেমনি নিসাড়ে চলিল তাহার পিছনে পিছনে।

অল্প তফাতেই পাশাপাশি দুইটা তাঁবু, একটাতে কাফ্রী এবং অন্যটাতে সাহেব অঘোরে ঘুমাইতেছিল। তাহাদের দুই তাঁবুর মাঝখানে—ফাঁকা জায়গাতে ছিল সিংহীর পিঁজরা। ইসারা করিয়া কুমীরকে সেই পিঁজরাটা দেখাইয়া দিয়াই ওগাঙ্গি—বিদ্যুতের মতো—চকিতে ছুটিয়া আসিয়া ঢুকিল নিজের ঘরের ভিতরে।

মিনিট পাঁচেক পরেই হঠাৎ চারিদিক কাঁপাইয়া সিংহীর কাতর স্বর উঠিল। পরক্ষণেই, কুমীরও নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিয়া চৌবাচ্চায় উঠিয়া জলে ডুবিয়া গেল।

সিংহীটা চার পাঁচবার কাতর শব্দ করিয়া আবার নীরব হইল। সেই সঙ্গে সাহেব এবং কাফ্রীটার কথার আওয়াজ শুনিয়া ওগাঙ্গির ঠোঁটে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল।

পরদিন বিকালে—সহরের সাহেবদের চেষ্টায়—স্কুলের ছেলেরা সিংহীর খেলা দেখিতে আসিল। সাহেব মাষ্টারদের খাতির-যত্ন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। খেলা দেখাইতে নামিল কাফ্রী চাকরটা।

প্রকাণ্ড খাঁচার ভিতরে, এক কোণে শুইয়া পড়িয়া সিংহী ধুঁকিতেছিল। খাঁচার ভিতরে, দুইদিকে, দুইটা উঁচু পাটাতন ছিল। তাহার মাঝখানে দাঁড়াইয়া খেলোয়াড় কখনো জ্বলন্ত আগুনের বেড়া, কখনো সিঁড়ি, কখনো চেয়ার প্রভৃতি ধরিতেন।

সিংহী নানা রকম করিয়া তাহাদের ভিতর দিয়া এক পাটাতন হইতে অন্য পাটাতনে যাওয়া আসা করিত।

কাফ্রী সিংহীর পিঁজরায় ঢুকিতেই, ছেলেরা উৎসাহে হাততালি দিয়া উঠিল। ফূর্তি পাইয়া কাফ্রীও সিংহীকে তুলিয়া খেলা দেখাইতে গেল। কিন্তু সে দিন সিংহী উঠিতে চাহিল না।

বারকতক চেষ্টা করিয়া, তুলিতে না পারিয়া, কাফ্রীটা একটা লোহার শিক লইয়া সজোরে খোঁচা মারিল সিংহীর পাঁজরাতে। সিংহী আর থাকিতে পারিল না, রাগে ও যাতনায় হঠাৎ বিকট গর্জ্জন করিয়াই লাফাইয়া পড়িল গিয়া একেবারে কাফ্রীটার উপরে। সঙ্গে সঙ্গে দু'জনেই পিঁজরার ভিতরে গড়াইল।

চারিদিকে বিষম হট্টগোল উঠিল। ভয়ে সকলের বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। মাষ্টারেরা ছেলেদের লইয়া বাহিরে পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন সাহেব তাড়াতাড়ি ঢুকিলেন গিয়া পিঁজরার ভিতরে। লাঠি-সোঁটা লইয়া কতকগুলি বাহিরের মানুষ পিঁজরা ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

অতি কষ্টে কাফ্রীটারে ছাড়াইয়া, পিঁজরার বাহিরে আনিয়া সাহেব দেখিলেন, তেমন গুরুতর না হইলেও কাফ্রীর শরীরের অনেক জায়গা ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতেছে এবং সে নিজেও অজ্ঞানের মতো হইয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন।

লোকেরা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেল। সেদিন আর খেলা হইবে না জানাইয়া দিয়া, সাহেব অবস্থা দেখিবার জন্য সিংহীর পিঁজরার ভিতরে গিয়া ঢুকিলেন।

সিংহী তখন একধারে শুইয়া পড়িয়া কুকুরের মতো জিভ্ বাহির করিয়া ধুঁকিতেছিল। সাহেব কাছে গিয়া বসিতেই সে তাঁহার হাত চাটিতে লাগিল। পরীক্ষা করিয়া সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন যে, সিংহীরও সুমুখের দুই পায়ের ভিতরের দিক্‌টা ছিঁড়িয়া রক্তময় হইয়া গেছে এবং গায়েরও জায়গায়-জায়গায় ঘায়ের চিহ্নের অভাব নাই।

সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন—কারণ বুঝিতে পারিলেন না। হঠাৎ আগের রাত্রের সিংহীর চীৎকারের কথা মনে পড়িল, অমনি ঘোর সন্দেহ হইল ঔগাঙ্গির উপরে। কি করিবেন ঠিক করিতে না পারিয়া, ডাক্তার আনিয়া সিংহীর ঘায়ে ঔষধ বাঁধিয়া দিলেন। তারপর কুকুরের মতো তার গলায় শিকল বাঁধিয়া খাঁচা হইতে লইয়া গিয়া রাখিলেন নিজের তাঁবুর ভিতর।

সিংহীকে তাঁবুতে রাখিয়া সাহেব হাসপাতালে যাইতে-ছিলেন, হঠাৎ দেখিলেন ঔগাঙ্গি কুমীরের জন্য কতকগুলি মাছ লইয়া আসিতেছে। ঔগাঙ্গিকে দেখিয়াই তাঁহার রক্ত গরম হইয়া উঠিল, 'ড্যাম্' 'শুয়ার' বলিয়া তাহাকে ঘা-কতক জোরে-জোরে মারিয়া—গট্-গট্ করিয়া চলিয়া গেলেন। সেই দিকে চাহিয়া ঔগাঙ্গি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রাগে ফুলিতে লাগিল।

গভীর রাত্রে সাহেব নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছিলেন, হঠাৎ সিংহীর চীৎকারে সাহেবের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চমকিয়া উঠিয়াই সভয়ে দেখিলেন—করাতের মতো সারি-সারি তীক্ষ্ণ দাঁতওয়ালা

প্রকাণ্ড লম্বা একটা হাঁ, একেবারে তাঁহার গায়ের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে।

বিষম ভয়ে চীৎকার করিয়াই সাহেব, চকিতে মাথার বালিশের নীচ হইতে ভরা পিস্তল বাহির করিয়া সেই সাংঘাতিক হাঁয়ের ভিতরে গুলি করিলেন। অমনি এক ভয়ানক ব্যাপার ঘটিল।

বারকতক সপাৎ সপাৎ করিয়া বিকট একটা শব্দ হইল, সঙ্গে-সঙ্গে সিংহীও গর্জ্জন করিয়া লাফাইয়া পড়িল তাঁহারই গায়ের উপর। আবার অমনি তাঁবুর আধখানা ভাঙ্গিয়া চাপা পড়িল তাঁহার উপর। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তীক্ষ্ণ দাঁতের ঘায়ে সাহেবেরও শরীরের নানা জায়গা ছিঁড়িয়া গেল।

বহু কষ্টে বাহির হইয়া—ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে—সাহেব দেখিলেন—ঔগাঙ্গির কুমীর সেইখানেই মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

পরদিন সকালে সে অঞ্চলে ঔগাঙ্গির চিহ্ন পর্য্যন্ত কেহ কোথাও আর দেখিতে পাইল না। কিন্তু সাহেবকেও পাঁচ-ছয় মাসের জন্য হাসপাতালে গিয়া বিছানায় পড়িয়া থাকিতে হইল।

শয়তান

[১]

সরকারী কাজে বহাল হইয়া এক শিকারী সাহেব যখন দুয়ার অঞ্চলে গেলেন, তখন সেখানে—হিমালয়ের নীচে—তরাইয়ের বনে—বুনো হাতীর ভয়ে লোকে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল।

হিমালয়ের নীচে এই তরাইয়ের বন, দক্ষিণে—বাংলা দেশের দিকে প্রায় চল্লিশ মাইল এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে শত শত মাইল দূরে চলিয়া গিয়াছিল। সেই প্রকাণ্ড বনে ভয়ানক অজগর, বাঘ-ভালুকের তো কথাই নাই, প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড বুনো মহিষের পাল, বাইসন, গণ্ডার এবং জংলা হাতী যে কত দলে দলে নিশ্চিন্ত মনে রাজত্ব করিয়া বেড়াইত তাহার সংখ্যা হয় না। তবুও হিমালয়ের গায়ে ও আশে-পাশে চা-বাগান এবং পাহাড়িয়া লোকের বসতির অভাব ছিল না।

সেই ভয়ানক জানোয়ারের রাজ্যে হাতী শিকার করা সরকারের মানা ছিল। কিন্তু জংলা হাতী ক্ষেপিয়া মানুষ মারিতে কি চাষ-আবাদ নষ্ট করিতে সুরু করিলে তাহাকে মারা বারণ ছিল না। সাহেব যখন সেখানে গিয়া পৌঁছিলেন, তখন তেমনি একটা প্রকাণ্ড হাতী ক্ষেপিয়া এমন উপদ্রব সুরু করিয়াছিল যে, সে অঞ্চলের কি সাহেব-সুবো—কি দেশী মানুষ, সকলেই মহা ভয়ে প্রাণ হাতে করিয়া তটস্থ হইয়া দিন কাটাইতেছিল।

সাহেব গিয়া সেখানে বসিতেই সেখানকার লোক দলে দলে নিত্য তাঁহার কাছে আসিয়া—বুনো হাতীর উৎপাতের এমন ভয়ানক ভয়ানক গল্প শুনাইতে লাগিল যে, সাহেব তাহাদের সে সব কথা বিশ্বাস করিলেন না।

কিন্তু বেশী দিন কাটিল না, সপ্তাহখানেক না যাইতেই এমন এক ঘটনা ঘটিল যে, হাতে হাতে প্রমাণ পাইয়া তিনি আর সে সব কথা বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

পাহাড়ের উপরে সাহেব যেখানে আড্ডা করিয়াছিলেন, সেই জায়গাটার নীচের দিকে বন কাটিয়া একটা মালবহা ছোট রেলের লাইন পর্ব্বতের নীচে অল্প দূরে একটা ছোট ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়াছিল, তাহার নাম রাজভাতখাওয়া। তারই কাছে একটা সরকারী রাস্তা বনের ভিতরে ভিতরে কিছুদূর পর্য্যন্ত গিয়া, তারপর বাহির হইয়া গিয়াছিল চা বাগানের দিকে। কুলিদের জন্য চাল ডাল প্রভৃতি খাবার জিনিষ ঐ রাস্তায় আসিত এবং বাগানগুলি হইতে চা বোঝাই হইয়া চলিয়া যাইত সহরে।

বৈকাল বেলা সাহেব তাঁহার বন্দুক লইয়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত বেড়াইয়া আসিবার জন্য বাহির হইতেছিলেন, হঠাৎ আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন—জন পাঁচেক লোক নীচের দিক হইতে ছুটিয়া আসিতেছে। তিনি তখনি আরদালি পাঠাইয়া তাহাদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্যাপার কি?

তাহারা এক সঙ্গে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিয়া উঠিল—"হুজুর আজ এক শয়তান বেরিয়েছে।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—শয়তান কি ?

একজন জবাব করিল—"আজ্ঞে, ক্ষেপা হাতি! জংলা হাতী তো মানুষ মারে না, কি চাষ আবাদও নষ্ট করে না! যেগুলো শয়তান হয়ে একলা ঘুরে বেড়ায়, সেইগুলোই হয় সর্ব্বনেশে।"

"হাতী আবার শয়তান হয়ে একলা ঘুরে বেড়ায় কেন ?"—বলিয়া সাহেব একটুখানি মুখ টিপিয়া হাসিলেন। তখন সেই লোকগুলোর ভিতর হইতে বয়সে সকলের বড় একজন বলিল—

"আজ্ঞে হুজুর, হাতীরা দল বেঁধে থাকে। কোন দলেই বিশ চল্লিশের নীচে হাতী থাকে না, বরং একশ, কি তারও বেশী দেখতে পাওয়া যায়। বড় বড় দাঁতওয়ালা পুরুষ হাতী গুলোই দলের সর্দ্দারী করে। কিন্তু যখন বাচ্চা সঙ্গে থাকে, তখন সেগুলো গরু ছাগলের চেয়েও ঠাণ্ডা হয়ে বেড়ায়। আর বাচ্চা সঙ্গে নেই, এমন দলও বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। এই সব দল কারুর কোন ক্ষতি করে না। এরা বরং মানুষ দেখলে, কি মানুষের সাড়া পেলে, নিজেরাই তফাত থেকে পালিয়ে যায়।"

সাহেব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে শয়তান হয় কারা ? বনে কি আবার আলাদা রকমের হাতী আছে নাকি ?"

"না হুজুর!" বলিয়া লোকটা আবার বুঝাইয়া বলিতে লাগিল—

"শুনুন বল্‌ছি। হাতীর দলের ভিতরে এক একটা পুরুষ

হাতী চেহারাতেও যেমন প্রকাণ্ড, গায়েও তেমনি ভয়ানক জোরালো হয়ে ওঠে। দলের ভিতরে থাক্‌তে থাক্‌তে তাদেরই দু'একটার মেজাজ হঠাৎ এক এক সময়ে বিগড়ে গরম হয়ে যায়। তখন আর তারা দলের ভিতরে থাকতে পারে না। দল থেকে ছট্‌কে বেরিয়ে এক্‌লা এক্‌লা ঘুরে বেড়ায়। সেই গুলোই হয়ে দাঁড়ায় শয়তান।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"দল থেকে ছট্‌কে বেরিয়ে এক্‌লা একলা ঘুরে বেড়ায় কেন? তার কারণ কি?"

"আজ্ঞে হুজুর, মাথা গরম হয়ে ক্ষেপে যায় আর কি! তা' ছাড়া হাতী ধরবার জন্যে মানুষেরা এসে যখন হাতীর খেদা করে, সেই সব 'খেদার' লোকের তাড়া খেয়েও এক একটা সর্দ্দার হাতী বিষম বেগে ক্ষেপে উঠে দল থেকে ছট্‌কে বেরিয়ে পড়ে। সেই গুলোই হয় বিষম শয়তান। তাদের যত রাগ গিয়ে পড়ে মানুষের ওপোর। মানুষ দেখলে ত আর তার নিস্তারই রাখে না, মানুষের সাড়া পেলেও—ছুটে তেড়ে গিয়ে—খুঁজে খুঁজে তাকে না মেরে আর স্থির থাকতে পারে না।"

"শুধু কি তাই?" বলিয়া আর একজন কহিল—

"মানুষ মারবার জন্যে সেই শয়তানগুলো পথের ধারে এমন ভাবে ওৎপেতে লুকিয়ে থাকে যে, কিছুতেই টের পাবার যো নেই। এমনি লুকিয়ে থেকে কত মানুষ যে তারা মেরেছে তার ঠিকানা নেই। হাতীর দলগুলো পর্য্যন্ত শয়তানের সাড়া পেলে দূর থেকে পালিয়ে যায়।"

আর একজন বলিয়া উঠিল—"তা ছাড়া, আবার এমন শয়তানি বুদ্ধি যে, গরুর গাড়ী বোঝাই হয়ে যখন চাবাগানের কুলীদের জন্য রসদ আসে, সেই সময়ে হঠাৎ বেরিয়ে গরু, মানুষ মেরে, গাড়ী ভেঙ্গে সেই সব চাল ডাল খেয়ে যায়। এমনও দুই একবার হয়েছে। কিন্তু বাগান থেকে চা বোঝাই নিয়ে গাড়ী-গুলো যখন সহরের দিকে যায়, তখন সেগুলো খাবার জিনিষ নয় বলে—তাদের কিছু বলে না।"

প্রথম লোকটি বলিয়া উঠিল—"সেই রকম একটা ভয়ানক শয়তান আছে, সে ব্যাটা মাঝে মাঝে এই দিকে এসে পড়ে ছারখার করে দিয়ে যায়। সেটার দাঁত মোটে একটা, আর একটা দাঁত—কে জানে কেমন করে ভেঙ্গে গেছে। সেটার মত ভয়ানক শয়তান আর কেউ কখনো দেখেনি। একবার সে চলন্ত রেলগাড়ী উলটে ফেলে দিয়ে, রাজাভাতখাওয়ার ইষ্টিশান পর্য্যন্ত এসে, ঘর দোর ভেঙ্গে, মানুষ জন মেরে, ছারখার করে দিয়ে চলে গেছে। সেই পর্য্যন্ত এদিকে আর তাকে কেউ দেখেনি, কিন্তু আজ বোধ করি সে আবার এই অঞ্চলে এয়েছে।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন করে জানলে?"

লোকগুলি বলিল—"আমরা ইষ্টিশানের ওধারে—মাইল খানেক দূরে—তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসছি। ভাগ্যে দূর থেকে সাড়া পেয়েছিলুম, নইলে আর নিস্তার থাকতো না।"

সাহেব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"সেই এক দাঁতওয়ালা শয়তান নাকি? তাকে স্পষ্ট দেখেছো?"

সকলেই বলিয়া উঠিল—"আজ্ঞে হুজুর, স্পষ্ট দেখবার মতো কাছে গিয়ে পড়লে, কি আর প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারতুম ? অনেকখানি দূরে ছিলুম বলেই পালিয়ে আসতে পেরেছি। কিন্তু সত্যিই যদি সে ব্যাটা এসে থাকে, তা'হলে বস্তির ভিতরেও তো কেউ আমরা নিশ্চিন্তি হয়ে থাকতে পারবো না। কে জানে কখন এসে সব শেষ করে দিয়ে যাবে। মানুষের যম সে ব্যাটা—খুঁজে খুঁজে এসে—চাষবাস, ঘরদোর সব ছারখার করে দিয়ে যাবে। মানুষের ওপরেই তার যত রাগ। কি হবে হুজুর।"

"আচ্ছা, ভয় কোরোনা, আমি দেখ্ছি"—বলিয়া সাহেব জন দুই শিকারী চাকর এবং বন্দুক লইয়া বাহির হইতে গেলেন। কিন্তু সকলেই বাধা দিয়া বলিল—"আপনার এখানে দুটো ভালো শিকারী হাতী রয়েছে, তাদের একটার ওপোরে উঠে যান হুজুর! বনের ভিতরে পায়ে হেঁটে গেলে, যদি শয়তানের কাছে গিয়ে পড়েন, তা হলে আর রক্ষা থাকবে না।"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন—"তোমরা যখন স্পষ্ট দেখনি, তখন সেই একদাঁত ওয়ালা শয়তান তো না হতেও পারে, তবে আর ভয় কি ?"

সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল—"বলেন কি হুজুর! অন্য শয়তান হলেও, পায়ে হেঁটে গেলে—সাম্নে পড়লে—রক্ষা থাকবে না। সাবধান হয়ে যাওয়াই ভাল। আপনি একটা হাতী নিয়ে যান হুজুর!"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন—"দরকার হয়, কাল তখন হাতী

নিয়ে যাওয়া যাবে। আজ একবার আগে সন্ধান করে আসি যে সত্যি সেই এক দাঁতওয়ালা শয়তান এয়েছে, না আর কেউ ?”

এই বলিয়া সাহেব শিকারী চাকর দুইজনকে সঙ্গে লইয়া—পাহাড় হইতে নামিয়া—নীচের দিকে বনের ভিতরে গিয়া ঢুকিলেন। লোকগুলি তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে কিছু দূর পর্য্যন্ত গিয়া—পথ দেখাইয়া দিয়া—নিজেদের বস্তির দিকে চলিয়া গেল।

[২]

সরকারি রাস্তা ছাড়াইয়া বনের ভিতরের দিকে অনেকক্ষণ অবধি এদিক সেদিক ঘুঁরিয়াও সাহেব কিন্তু হাতীর সাড়া-শব্দ কিছুই পাইলেন না। ক্রমে বেলাও পড়িয়া আসিল। তখন তিনি বিরক্ত হইয়া ফিরিলেন। কিন্তু যে পথ দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আর ঠাহর করিতে পারিলেন না। পর্ব্বতের উপরে তাঁহার বাংলার দিকে নজর রাখিয়া—সোজা বন ভাঙ্গিয়া—আগাইয়া যাইতে লাগিলেন।

অল্প কিছুদূর যাইবার পরে, পাশের একটা ঝোপ হইতে হঠাৎ গোটাকতক বড় বড় বন-মোরগ বাহির হইয়াই ঝপ্-ঝপ্ করিয়া উড়িয়া চারিদিকে পলাইয়া গেল। সেগুলো যে চোখের পলকে কোথায় লুকাইয়া পড়িল, তিনি তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না। তাহাদের ভিতরে একটা কিন্তু সোজা উড়িয়া গিয়া বসিল—ঠিক তাঁহাদের সাম্‌নের দিকে—খানিক দূরে একটা বড় গাছের নীচের ডালে।

তত বড় প্রকাণ্ড মোরগ সাহেব আর কখনও দেখেন নাই। তাহাকে মারিবার জন্য সেই দিকে নজর রাখিয়া তিনিও তাড়াতাড়ি আগাইয়া চলিলেন। কিন্তু দু-'চার পা যাইতে না যাইতে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন যে, মোরগটা বিষম ভয়ে ছট্‌ফট্ করিতে করিতে সেখান হইতে উড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে বটে, কিন্তু কিছুতেই উড়িতে পারিতেছে না। কে যেন জোর করিয়া তাহাকে কেবলই নীচের দিকে টানিতেছে।

তিনি বুঝিতে পারিলেন না ব্যাপার কি! কিন্তু আর কয়েক পা আগাইয়া যাইতেই, কেমন একটা আশ্চর্য্য রকমের সোঁ-সোঁ শব্দ হঠাৎ তাঁহার কানে আসিল। বড়ই আশ্চর্য্য হইয়া সাহেব, যেমন একটা ঘন কাঁটা ঝোপ ঘুরিয়া সামনের দিকে আসিলেন অমনি বড় বড় গাছের ফাঁক দিয়া চোখে পড়িল—অল্পদূরেই প্রকাণ্ড একটা অজগর উপর দিকে মস্ত হাঁ করিয়া স্থির হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে!

তখন মোরগটার বিপদের অবস্থা এবং ভয়ের কারণ বুঝিতে তাঁহার আর বাকী রহিল না। তাড়াতাড়ি বন্দুক তুলিয়া সেটাকে গুলি করিতে গেলেন। কিন্তু তার আগেই মোরগটা গাছের উপর হইতে ঝট্‌পট্ করিয়া তাহার মুখের ভিতরে পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সাহেবও সাপটাকে গুলি করিয়া মারিয়া দেখিলেন যে, লম্বায় ষোল ফিটেরও বেশী হইল।

দিন দুই পরে, বনের ভিতরে—কিছুদূরে—একটা জায়গায় কতকগুলো সেগুন গাছ তদারক করিবার জন্য সাহেবকে বাহির

হইতে হইল। আগে জনকতক পাহাড়িয়া কুলির সঙ্গে দুই জন গুরখা সেপাইকে পাঠাইয়া দিয়া, ঘণ্টাখানেক পরে, তিনি হাতীতে চড়িয়া বাহির হইলেন।

মাইল তিনেক যাইবার পরে, তিনি এমন জায়গায় আসিয়া পড়িলেন যে, চারিদিকেই ঝোপের মত ঘন বন, হাতীর পিঠ ছাড়াইয়াও তিন-চার হাত উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ভিতর দিয়া মাহুত হাতীটাকে চালাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

মিনিট পাঁচেক সেই বনের ভিতর দিয়া যাইবার পরে সাহেব হঠাৎ পাশের দিকে বন ভাঙ্গার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কুলিদের চীৎকার শুনতে পাইলেন। চম্‌কাইয়া উঠিয়া তিনি মাহুতকে সেই দিকে হাতী চালাইতে হুকুম করিলেন।

পাশের দিকে কিন্তু বন এমন ঘন যে হাতীটা ফিরিয়া সেই দিকে যাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল বটে, কিন্তু অল্প একটু গিয়া আর কিছুতেই আগাইতে পারিল না। সাহেব তখন হাতীকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হুকুম দিয়া, হাতী হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং নিজের বন্দুক লইয়া—পায়ে হাঁটীয়া—অতি কষ্টে তাহার ভিতর দিয়া কোন রকমে পথ করিয়া আগাইয়া চলিলেন।

কিন্তু খানিক দুর যাইবার পরে, তিনি যে কোন দিকে যাইবেন তা আর ঠাহর করিতে পারিলেন না। একটুখানি স্থির হইয়া কান খাড়া করিয়া রহিলেন। কিন্তু কুলিদের আর কোন রকম শব্দ তাঁহার কানে আসিল না। চারিদিক ভালো করিয়া

দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু, তিনি যে কোন দিক হইতে আসিয়াছেন, তাহাও বুঝিতে পারিলেন না। উপায় না পাইয়া একদিকে নজর স্থির রাখিয়া অতিকষ্টে দুই হাতে বন ঠেলিয়া কোনও রকমে চলিতে লাগিলেন।

মিনিট দশেক তেমনি ভাবে যাইবার পরে সামনের দিকে বন অনেকটা ফাঁকা হইয়া আসিল। ফুরতি করিয়া তিনি আগাইয়া চলিলেন। কিন্তু রশিখানেক যাইতে না যাইতেই হঠাৎ বিকট গর্জ্জন করিয়—ঠিক যেন মাটী ফুঁটিয়া—প্রকাণ্ড একটা বুনো হাতী প্রায় তাঁহার উপরে আসিয়া পড়িল। সাহেব চম্‌কাইয়া দেখিলেন হাতীটার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুটো দাঁত্ এবং শুঁড়ের প্রায় আধখানা সদ্য রক্তে ভিজিয়া লাল হইয়া রহিয়াছে!

আর ভাবিবার সময় কি পলাইবার উপায় ছিল না। সাহেব চোখের পলকে তাঁহার 'রাইফেল' বন্দুক তুলিয়াই গুলি করিলেন—গুড়ুম! গুলিটা কিন্তু হাতীর মগজে না লাগিয়া শুঁড়ের গোড়ার দিকে একটুখানি কাটিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহাতে সে আরো ক্ষেপিয়া গিয়া যমের মতো তাঁহাকে ধরিতে আসিল। সাহেব প্রাণের আশা ছাড়িয়া আবার তাগ করিয়া বন্দুক ছুড়িলেন।

এবার গুলিটা গিয়া লাগিল হাতীর কপালে। মিনিটখানেকের জন্য হাতীটা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া সাহেবের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর কে জানে কি ভাবিয়া—হঠাৎ পিছন ফিরিয়াই—ছুটিয়া গভীর বনের ভিতরে কোন দিকে যে চলিয়া গেল, তা আর তিনি ঠাহর করিতে পারিলেন না।

খানিকক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া সাহেবও বন্দুক ঠিক করিয়া লইয়া বন হইতে বাহির হইবার জন্য আবার আগাইয়া চলিলেন। বন ক্রমেই ফাঁকা হইয়া আসিতেছিল। মিনিট পনেরো যাইবার পরেই তিনি প্রায় সরকারি রাস্তার ধারে আসিয়া পড়িলেন। কিন্তু সেখানে যা তাঁর চোখে পড়িল, তাহাতে আর পা উঠিল না, ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ভয়ে কাঠ হইয়া দাঁড়াইলেন।

একটু পরেই তাঁহার একজন গুরখা সেপাই রাস্তার ওপাশের একটা ঘন ঝোপের ভিতর হইতে ভয়ে প্রায় মরার মতো হইয়া নিসাড়ে বাহির হইয়া আসিল। তার পোষাক সমস্ত ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, অস্ত্রশস্ত্র-বন্দুক কিছুই ছিল না। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে ?"

"ওই দেখুন হুজুর, এক শয়তান বেরিয়ে আমার জুরিদারকে কি রকম করে মেরে ফেলেছে, ওই দেখুন—আর চেন্‌বার যো নেই। দাঁত দিয়ে ফুঁড়ে ফুঁড়ে সমস্ত শরীর টুকুরো টুকুরো করেছে। তারপর পা দিয়ে মাড়িয়ে একেবারে কাদার মতো করে দেছে। আমি কোন রকম করে নিসাড়ে লুকিয়ে থেকে প্রাণ বাঁচিয়েছি। কুলিগুলো—কাঠবিড়ালের মতো—গাছে উঠে, গাছে-গাছে পালিয়ে বেঁচেছে। কেবল ওই বেচারাই পালাতে না পেরে প্রাণ দেছে। প্রকাণ্ড বড় শয়তান—সারা মুখ তার আমার জুড়িদারের রক্তে লাল হয়ে গেছে।

কুলির কথা শুনিয়া সাহেবের বুঝিতে বাকী রহিল না কেন হাতীটার শুঁড় ও দাঁত দুটো রক্তে লাল হইয়াছিল। নিজের

দশা ভাবিয়া তিনিও মনে মনে কাঁপিয়া উঠিলেন এবং সেদিন প্রাণ রক্ষার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে দিতে বাংলাতে ফিরিলেন।

[৩]

সাহেবের কাছে যে পোষা হাতী দুইটা ছিল, তাহাদের একটাকে বড় বাহির করা হইত না, কিন্তু অন্যটাকে তাহার মাহুত প্রায় রোজই বনে লইয়া গিয়া তাহার পিঠে বোঝাই করিয়া হাতীদের খাওয়াইবার জন্য গাছের পাতা ও ডালপালা প্রভৃতি আনিত।

সপ্তাহখানেক পরে, বিকালের দিকে বাংলার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই, সাহেব হঠাৎ আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন—নীচে বনের ভিতর হইতে সেই হাতীটা বিষম ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বাংলার দিকে পলাইয়া আসিতেছে—তার সারা গা রক্তে লাল হইয়াছে—পিঠে তাহার মাহুত নাই। তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় মাহুতকে ডাকিয়া দেখাইয়া কহিলেন—"ও একলা অমন করে জখম হয়ে ছুটে পালিয়ে আস্‌ছে কেন দেখ, খোঁজ কর, ওর মাহুত কোথায়?"

কিন্তু তাহাকে আর বেশী খুঁজিতে হইল না। খানিকপরেই সেই মাহুতও ছুটিয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সাহেবকে বলিল "হুজুর, সেই এক দাঁতওয়ালা শয়তান আবার ফিরে এসেছে। মাইল দুই তফাতে যেতে না যেতে দূর থেকে আমাদের 'বেগমকে' দেখতে পেয়েই বিষম বেগে তেড়ে এসে ধরেছিলো।

বেচারাকে জখম করে দেছে, তাই দেখে, কোন রকমে খপ করে বেগমের শুঁড় বেয়ে নেমে পড়েই প্রাণের দায়ে আমাকে লুকোতে হয়েছিলো। বেগম খুব শিকারী আর চালক হাতী বলেই, আজ আমরা দু'জনেই রক্ষা পেয়েছি। প্রায় মাইলখানেকেরও বেশী পথ পর্য্যন্ত ব্যাটা এমন ভাবে তেড়ে এসেছিলো যে, আমি তার পিঠে থাকিলে দু'জনেই প্রাণ হারাতুম।"

পরের দিন সকালেই সাহেব তাঁহার শিকারী আরদালিকে সঙ্গে লইয়া বেগমের পিঠে চড়িয়া শয়তানের খোঁজে বাহির হইলেন। কিন্তু সারাদিন ধরিয়া বনে ঘুরিয়া ঘুরিয়াও তাহার সন্ধান না পাইয়া সন্ধ্যার সময়ে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

দিন দুই পরে সাহেব খবর পাইলেন যে, একটা চা-বাগানের কুলিদের বস্তির ভিতরে ঢুকিয়া সেই এক দাঁতওয়ালা শয়তান সাত-আট জন মানুষ মারিয়াছে এবং সমস্ত বস্তি ছারখার করিয়া দিয়া গিয়াছে।

চারদিন পরে আবার খবর আসিল যে, ষ্টেশনের কাছেই রাস্তার উপরে সেই শয়তান দু'জন কুলি ও রেলের এক জমাদারকে এমন ভাবে মারিয়া রাখিয়া গেছে যে, তাহাদের কাহাকেও আর মানুষ বলিয়া চিনিবার উপায় নাই।

তখন সাহেব আর কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। সেই এক দাঁতওয়ালা শয়তানকে মারিবার, কিম্বা সে অঞ্চল হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য রীতিমত বন্দোবস্ত করিয়া সাহেব তাঁহার সমস্ত দল-বল লইয়া বাহির হইলেন।

দুইটা হাতীকেই পিঠে গদী বাঁধিয়া সাজানো হইল। বেগমের পিঠে উঠিলেন নিজে সাহেব তাঁহার শিকারী আরদালিকে লইয়া। আর অন্য হাতীটার পিঠে তাঁহার দুইজন শিকারী জমাদার উঠিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বাকী সেপায়েরা পর্ব্বতের অনেকখানি নীচ পর্য্যন্ত আসিয়া—একটা সরু নদীর ধারে—ফাঁকা জায়গাতে—তাঁবু ফেলিয়া রহিল।

কিন্তু প্রায় চারমাইল পথ গিয়াও শয়তানের সন্ধান মিলিল না। দুইটা হাতীর পিঠ হইতে দু'জনেই চারিদিকে যতদূর নজর যায়—ভালো করিয়া দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলেন। কিছু দূরে একটা টিলার পাশে কতকগুলো কালসার হরিণ দেখিয়া সাহেব, সেইদিকে বেগমকে লইয়া যাইতে কহিলেন।

চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সেগুন গাছ হইতে নানারকমের বুনো লতা ঝুলিয়া সে দিকটা পরদার মতো প্রায় ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। তাহার ভিতর দিয়া ঠেলিয়া বেগম বাহির হইতেই গাছের ফাঁক দিয়া সকলে দেখিতে পাইল, সামনের দিকে—আন্দাজ সত্তর-আশী হাত দূরে—কতকগুলো বড় বড় গাছের ভিতরে প্রকাণ্ড একটা দাঁতওয়ালা হাতী দাঁড়াইয়া মাথা নীচু করিয়া ঝিমাইতেছে।

হাতীটা এড়ো ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল বলিয়া কেহই বুঝিতে পারিল না সেটা সেই এক দাঁতওয়ালা শয়তান কি না? আরদালি সাহেবকে গুলি করিতে বলিল। বেগমের মাহুত কিন্তু সাহেবকে মানা করিয়া তাহার হাতীকে দাঁড় করাইল। সাহেবও

বুঝিলেন যে, যদি শয়তান না হইয়া অন্য হাতী হয়, তা' হইলে গুলি করা বে-আইনী কাজ হইবে। কাজেই তিনিও বন্দুক ঠিক করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন।

একটু পরেই হাতীটার ঘুম ভাঙ্গিতে সে একবার সেই দিকে মুখ ফিরাইল। সকলেই সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল যে, তার বাঁ দিকের দাঁতটা নাই,—গোড়া হইতে ভাঙ্গিয়া গেছে। মাহুত, বিষম ভয়ে চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল,—"ওই সেই এক দাঁতওয়ালা শয়ত্মান !

মাহুতের কথা শেষ হইতে না হইতেই শয়তান হঠাৎ শুঁড় গুটাইয়া উঁচু করিয়া—বিষম গর্জ্জনে আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া—রাক্ষসের মত তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে ছুটিল। সকলেই বিষম ভয়ে এক সঙ্গে চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—"মারুন সাহেব, গুলি করুন, নহিলে আর কারুর রক্ষা থাকবে না—এসে পড়্‌লো বলে !"

কিন্তু, সাহেব গুলি করিবেন কি, শয়তানের গর্জ্জন শুনিয়া এবং তাহাকে তাড়া করিয়া আসিতে দেখিয়া, বেগম হঠাৎ বিষম ভয়ে পিছন ফিরিয়াই এমন ভাবে ছুটিল যে, তার পিঠে বসিয়া থাকাই ভার হইয়া উঠিল।

মাহুত তাহাকে থামাইবার জন্য জোরে জোরে তাহার মাথায় ডাঙ্গস্ মারিতে লাগিল, কিন্তু তবুও বেগম থামিল না। পিছনে শয়তান তাড়া করিয়া বিষম জোরে ছুটিয়া আসিতেছিল। সাহেব আর বসিয়া থাকিতে না পারিয়া, সেই দিকে মুখ করিয়া, গদীর উপরে প্রায় উপুড় হইয়া পড়িলেন।

দেখিতে দেখিতে শয়তান অনেকখানি কাছে আসিয়া পড়িল। কিন্তু বেগম প্রাণপণে ছুটিয়া পলাইতেছিল বলিয়া তিনি কিছুতেই শয়তানের মগজ তাগ করিয়া বন্দুক ছুড়িতে পারিলেন না। কিন্তু মাহুত, একবার পিছন দিকে চাহিয়াই চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—"না, বেগম থাম্‌বে না হুজুর, কিছুতেই তাকে বাগ মানাতে পারছিনি, ওই ভাবেই গুলি করুন।"

শয়তান প্রায় চল্লিশ হাত কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল। সাহেব আর থাকিতে না পারিয়া আন্দাজেই বন্দুক ছুড়িলেন। গুলি শয়তানের কাঁধে বিঁধিল। তাহাতে সে তো থামিলই না, বরং আরো দু'গুণ তেজে তাড়া করিয়া কাছে আসিয়া পড়িতে লাগিল।

কিন্তু বন্দুকের শব্দ হইবামাত্রই বেগম বুঝিল যে, তার পিঠের শিকারী বন্দুক চালাইতেছে, কাজেই আর ভয়ের কারণ নাই। সে তখনি আবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তাহাতে সুবিধা পাইয়া এবার সাহেব শয়তানের মগজ তাগ করিয়াই বন্দুক ছুড়িলেন—গুড়ুম!

গুলিটা শয়তানের মাথায় লাগিল বটে, তবু সে পড়িল না, কি থামিল না। কিন্তু আর তাঁহাদের দিকে না গিয়া—একটু ফিরিয়া পাশের বনের দিকে ছুটিয়া চলিল।

সাহেব তাড়াতাড়ি বন্দুক ভরিয়া লইয়া আবার গুড়ুম করিয়া আর একটা গুলি ছুড়িলেন। সে গুলিটা শয়তানের পাঁজরাতে গিয়া বিঁধিল। তবুও সে একটুও কাঁপিল না কি থামিল না। ঠিক সমান বেগেই বনের ভিতরে ঢুকিয়া কোথায় পলাইয়া গেল।

সাহেব ভাবিলেন—তিনটা গুলি খাইয়া শয়তান কখনই পলাইতে পারিবে না, কাছেই কোথাও গিয়া পড়িয়া যাইবে। আশায় মাতিয়া তিনিও পিছনে পিছনে হাতীকে চালাইয়া লইয়া যাইতে হুকুম করিলেন। মাহুতের ইসারাতে বেগমও বেশ ফূরতি করিয়া শয়তানের পিছনে পিছনে সেই বনের ভিতরে গিয়া ঢুকিল।

[৪]

কিন্তু মাইলখানেকের ভিতরে কোথাও শয়তানের চিহ্ন পর্য্যন্ত কেহ দেখিতে পাইল না। তারপরে একটা ফাঁকা জায়গার মুখে গিয়া পড়িতেই সকলে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে, আন্দাজ ষাট সত্তর হাত দূরে শয়তান—আগের বারের মতোই—এড়ো দিকে দাঁড়াইয়া নিঝুম হইয়া ঝিমাইতেছে।

সাহেব ভাবিলেন যে, হাতীটা সাংঘাতিক জখম হইয়াছে, আর ছুটিতে কি তাড়া করিতে পারিবে না। আরদালিকে বলিলেন—"যদি ও ফের তাড়া করে মারতে আসে, তবেই ওর হাঁটুতে গুলি করে খোঁড়া করে দেবার চেষ্টা করিস্, নইলে মারিস্নি।"

এই বলিয়াই তিনি তাগ করিয়া শয়তানের ডান কানের ঠিক পিছনে গুলি করিলেন। সকলেই ভাবিল যে, এবার সে সঙ্গে সঙ্গেই পড়িয়া যাইবে। কিন্তু, যেমন গুলি গিয়া শয়তানের কানের পিছনে লাগিল, অমনি সে বিদ্যুতের মত ফিরিয়াই বিষম বেগে আবার তাড়া করিয়া অনেকখানি কাছে গিয়া পড়িল।

সঙ্গে সঙ্গে সাহেব, আবার তাহার কপাল তাগ করিয়া গুলি করিলেন, এবং আরদালিও গুলি করিল তার বা পায়ের হাঁটুতে।

কিন্তু তবুও শয়তান পড়িল না। মিনিটখানেকের জন্য একবার স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া, হঠাৎ পরক্ষণে পিছন করিয়া এমন চকিতে ছুটিয়া গভীর বনের দিকে লুকাইয়া পড়িল যে, আর কেউ তাহাকে দেখিতে পাইল না। সাহেব আহ্লাদে চেঁচাইয়া উঠলেন—ব্যাটার আশ্চর্য্য ক্ষমতা—খোঁড়াতে খোড়াতে পালালো। কিন্তু ছ'টা গুলি খেয়েছে আর বেশিদূর ওকে যেতে হবে না! শিগ্‌গিরি পিছনে পিছনে চল।

বাস্তবিক খানিকদূর যাইবার পরেই, সকলে দেখিল যে, খুব মোটা একটা গাছে ঠেস দিয়া শয়তান প্রায় হেলিয়া পড়িয়াছে। এবার কিন্তু তাঁহাদের দেখিবামাত্র শয়তান—চকিতে সামলাইয়া—একেবারে ঝড়ের মতো তাড়া করিয়া গেল। সাহেবও তখনি উপরি-উপরি দুইবার গুলি করিলেন তার মাথা তাগ করিয়া এবং আরদালিও আবার গুলি করিল তার সেই হাঁটুতেই।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে—নয়টা গুলি খাইয়াও এবার শয়তান এমন ভাবে বনের ভিতরে পলাইল যে, তার পিছনে পিছনে গিয়া দুই ঘণ্টা ধরিয়া খুঁজিয়াও সাহেব আর তার সন্ধান করিতে পারিলেন না। বেলা পড়িয়া আসিতেছে দেখিয়া সে দিন তাঁহাদের ফিরিতে হইল। পাহাড়ের নীচে তাঁবুতে সাহেব যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন অন্ধকার ঘন হইয়া উঠিতেছে। তাঁবুর চারিদিকে সারারাত্রি আগুন জ্বালাইয়া, পালা করিয়া

পাহারা দিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া সাহেব বিশ্রাম করিতে গেলেন।

গভীর রাত্রে হঠাৎ একবার ঘুম ভাঙ্গিতেই সাহেবের মনে হইল যে তাঁবুর কাছে হাতী আসিয়াছে। তিনি তাড়াতাড়ি বন্দুক লইয়া বাহির হইলেন, কিন্তু কোথাও হাতী দেখিতে পাইলেন না। একজন সেপাই তাঁবুর দোরে পাহারা দিতেছিল, সেও কিছু বলিতে পারিল না।

কিন্তু সকাল হইলেই, নদীর ধারে গিয়া সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন যে, ভিজা বালির উপরে হাতীর অনেকগুলি পায়ের দাগ বেশ স্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তার ভিতরে একটা পা যে টানিয়া-টানিয়া লইয়া গেছে, তার দাগও পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। সাহেব আর দেরী না করিয়া, তাড়াতাড়ি হাতী সাজাইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

আগের দিন জমাদার দু'জন—খানিকদূর যাইবার পরে—দ্বিতীয় হাতীটাকে লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। সে দিন তারাও বরাবর সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কিন্তু ক্রমাগত তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত গিয়াও কেহই শয়তানের সন্ধান করিতে পারিল না।

তারপর সাহেব একটা দিক নজর করিয়া সোজা হাতী চালাইতে বলিলেন। সেই দিকে মাইল চার পাঁচ যাইবার পরে হঠাৎ সামনে একটা মস্ত বড় বড় ঘাসের জঙ্গল পড়িল। তার ভিতরে ঢুকিয়া অল্প দূর আগাইয়া যাইতেই হঠাৎ সকলে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল,—একটা জায়গার ঘাস অনেকখানি জায়গা

জুড়িয়া ছিঁড়িয়া, পিষিয়া, বসিয়া গেছে এবং তার উপরে নানা জায়গায় রক্তের দাগ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। দেখিয়াই সাহেব বলিয়া উঠিলেন—"রাত্রে শয়তান এইখানে এসে শুয়েছিলো, এখনো বোধ করি কাছেই কোথাও আছে।"

সেই কথায় সকলেরই উৎসাহ বাড়িল। মাহুত দু'জনও হাতী চালাইয়া, ঘাসের জঙ্গল পার হইয়া, এমন একটা জায়গায় গিয়া পড়িল যে, সেখানে সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঁটার ঝোপ, গাছের ডাল-পালা আর ঘন লতায় এমন জমাট বাঁধিয়া আছে যে তার ভিতরে ঢুকিবার উপায় নাই। হঠাৎ চমকাইয়া সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন যে, তারই একটা ঝোপের ভিতরে সেই শয়তান বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! কিন্তু কেমন করিয়া অত বড় প্রকাণ্ড শরীর লইয়া সে যে তার ভিতরে গিয়া ঢুকিল, তাহা কেহই ঠিক করিতে না পারিয়া হতভম্ব হইয়া পড়িল।

সাহেব ঝোপের চারিদিকে হাতী ঘুরাইয়া ঢুকিবার পথ খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু দুটো হাতীর একটাও তার ভিতরে এক পা আগাইয়া যাইবার পথ পাইল না। সাহেব বিষম ভাবনায় পড়িলেন।

হঠাৎ তাঁহার জমাদার দু'জন হাতী হইতে নামিয়া পড়িয়া বেজায় সাহস দেখাইয়া তাহার ভিতরে ঢুকিতে গেল। সাহেব তাহাদের কিছুতেই থামাইতে পারিলেন না। তখন আর উপায় না দেখিয়া তিনিও হাতী হইতে নামিলেন এবং তাহাদের বাঁচাইবার জন্য নিজে চলিলেন আগে আগে।

কিন্তু দশ পনেরো পা যাইতে না যাইতেই শক্ত শক্ত ঘন লতা, ঘন-ঘন ডাল পালা এবং সাংঘাতিক মোটা মোটা বিষম কাঁটায়—ঠিক জালের মত করিয়া—তাহাকে এমন ভাবে আটকাইয়া ফেলিল যে, সাহেব আর না পারিলেন আগাইতে, না পারিলেন পিছাইয়া আসিতে। এমন কি, হাত পা নাড়িবারও উপায় রহিল না। সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে জমাদার দু'জনেরও ঠিক সেই দশা ঘটিল।

ওদিকে সময় বুঝিয়া শয়তানও ঠিক সেই সময়ে শুঁড় তুলিয়া তাড়া করিয়া আসিল। সাহেব জীবনের আশা ছাড়িয়া চোখ বুজিয়া ঈশ্বরের নাম লইলেন। দেখিতে দেখিতে শয়তানও আসিয়া পড়িল একেবারে দশ হাত তফাতে। জমাদার দুইজন হায় হায় করিয়া উঠিল।

ঠিক সেই সময়ে মাহুত দু'জন আর থাকিতে না পারিয়া তাহারা হাতীর মাথায় এমন জোরে জোরে ডাঙ্গস্ মারিতে লাগিল যে, যাতনায় মোরিয়া হইয়া হাতী দুটো হঠাৎ গাঁ-গাঁ করিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে হুড়মুড় করিয়া, ঝোপ-ঝাড় ভাঙ্গিয়া আগাইয়া চলিল সাহেবের দিকে। হঠাৎ তাদের চীৎকার শুনিয়া শয়তান থমকাইয়া দাঁড়াইল। তারপর তাদের সেইভাবে আগাইতে দেখিয়া—কে জানে কি ভাবিয়া—এক পা, এক পা করিয়া পিছাইতে পিছাইতে, হঠাৎ পিছন ফিরিয়াই কে জানে কোনদিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া মাহুত দু'জন হাতী হইতে নামিয়া

পড়িল, তারপর অস্ত্র দিয়া অনেক কষ্টে ঝোপ-ঝাড় কাটিয়া সাহেব ও জমাদার দু'জনকে বাহির করিয়া আনিল।

তারপর, বেগমের পিঠে চড়িয়া সাহেব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। কিন্তু সাতদিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত সেই বনের ভিতরে ঘুরিয়া ঘুরিয়াও, আর কোথাও শয়তানের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলেন না।

যমের সঙ্গে

[১]

উত্তর আমেরিকার কলম্বিয়া অঞ্চলে প্রশান্ত মহাসাগরের পাহাড়ময় উপকূলে—একটা প্রণালীর মুখে একখানা ছোট জাহাজ ডুবিলে, সেই ডুবো জাহাজের কাজ লইয়া নিকলসন্ যখন সমুদ্রের তলায় নামিতে গেল তখন সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই যে, তাহাকে ধরিবার জন্য যমও ওৎপাতিয়া তাহার পিছনে-পিছনে সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

নিকল্‌সন্ যুবা পুরুষ। দেখিতে যেমন দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড চেহারা, গায়ের জোরও তেমনি অসাধারণ, আর ওজনেও প্রায় তিন মণের কাছাকাছি। তার উপর সাহসের তো কথাই নাই। যে সকল দুঃসাহসের কাজে কেউ আগাইতে সাহস না করে, নিকল্‌সন্ মাতিয়া উঠে সেই সকল বিপদের কাজ হাতে পাইলে। আর যতক্ষণ না সে কাজ শেষ করিতে পারে, ততক্ষণ তাহার

আহার-নিদ্রা তো দূরের কথা, বিশ্রামের নাম পর্য্যন্তও তার মনে থাকে না। এই সকল গুণে সে অঞ্চলের ডুবুরীদের ভিতরে নিকল্‌সন্ সকলের চেয়ে বড় হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু তার মজুরী বেশী ছিল বলিয়া ছোটখাটো ডুবুরীর কাজে তার বড় একটা ডাক পড়িত না। কিন্তু যে কাজে অন্য ডুবুরীরা হার মানিত, কিম্বা যে সকল বিপদের জায়গায় জাহাজ ডুবিলে দ্বিগুণ মজুরীর লোভেও ডুবুরীরা সমুদ্রের তলায় যাইতে সাহস করিত না, সেই কাজে এবং সেই সকল জায়গায় নিকল্‌সন্‌কে না লাগাইলে চলিত না।

তাই যখন ডুবো জাহাজখানার মালিকেরা অন্য ডুবুরী না পাইয়া চারগুণ বেশী মজুরী দিতে স্বীকার হইয়াও নিকল্‌সন্‌কে কাজে লাগাইল, তখন তাহার বন্ধুরা বাধা দিবার চেষ্টায় তাহার কাছে গিয়া আশ্চর্য্য ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি সত্যি সত্যি ওই ডুবো জাহাজখানার কাজ নিয়েছ না কি নিকল্ ?"

নিকল্‌সন্ হাসিয়া জবাব করিল—"অনেকগুলো টাকা, তাই লোভ ছাড়্‌তে পারলুম না ভাই! আর কাজও এমন বেশী কিছু নয়।"

একজন জিজ্ঞাসা করিল—"কি তোমাকে করতে হবে ?"

নিকল্‌সন্ বলিল—"জাহাজখানার ভিতরে দামী জিনিষে ভরা গোটা চারেক সিন্দুক আছে। সেই সিন্দুকগুলোকে তুলে দেবার কথা।"

একজন বুড়া ডুবুরী বলিয়া উঠিল—"বুঝেছি মালিকদের মতলব। একাজ একদিনে মিটবে না। পাঁচ-সাত দিন কি আরো

বেশী লাগতে পারে। জাহাজখানা খারাপ জায়গায় ডুবেছে। কোন ডুবুরী ভয়ে ওজায়গায় নামতে রাজী হয়নি; তাই অনেক টাকা স্বীকার পেয়ে তোমাকে ওই সাংঘাতিক কাজে বহাল করেছে। উপরি-উপরি পাঁচ-সাত দিন তুমি যদি ওইখানে ডুবে—সমুদ্রের তলায় গিয়ে—ওদের কাজ হাসিল করে দিতে পার, তা'হলে অন্য ডুবুরীদের আর ওখানে ডুবতে ততটা ভয় থাক্‌বে না। তখন কম মজুরীতে অন্য ডুবুরীদের নামিয়ে জাহাজখানাকে তোলবার চেষ্টা করবে।"

"হতে পারে।" বলিয়া নিকল্‌সন্‌ আবার একটু হাসিল। কিন্তু বুড়ো ডুবুরী জোর গলায় বলিয়া উঠিল—"হতে পারে কি? যা বল্লুম তা নিশ্চয়! আমরা গরীব, বড় মানুষদের কাছে আমাদের প্রাণের দাম কিছুই নেই। তাই, আমাদের প্রাণ নিয়ে ব্যবসায় করে, বড় মানুষেরা দিন-দিন টাকার কুমীর হচ্ছে। কিন্তু আমরা নিজেরা আমাদের মুখপানে কেউ ফিরেও চাই না—এই আমাদের সব চেয়ে বড় দুঃখ।"

নিকল্‌সন্‌, কথাটা ভাল বুঝিতে না পারিয়া, বুড়োর মুখের পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহা দেখিয়া আরো একজন তাহার সমবয়সী ডুবুরী জিজ্ঞাসা করিল—"অমন করে চেয়ে রয়েছ যে? কথাটা কি বুঝতে পারলে না?"

"না ভাই, সত্যিই তোমাদের কথার মানে বুঝতে পারিনি।"—বলিয়া নিকল্‌সন্‌ আবার চাহিয়া রহিল ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া। বুড়ো ডুবুরী তখন বলিল—"শোন, দিন কতক আগে ওরই কাছাকাছি

জায়গাতে আর একখানা জাহাজ ডুবি হয়েছে, জানোতো? তুমি নিজেও সেই ডুবো জাহাজখানা তুলে দেবার কাজ নেবার জন্য মালিকদের আফিসে গিয়েছিলে। তারা তোমাকে কি জবাব দিয়েছিলো বল দেখি?”

নিকল্‌সন্ বলিল—“তারা জবাব দিয়েছিল যে, তোমার মজুরী বড় বেশী। অত বেশী মজুরী দিয়ে আমরা ডুবুরী লাগাবো না।”

বুড়ো ডুবুরী বলিয়া উঠিল—“তা হলে বুঝে দেখ, অত দামের জাহাজখানা নষ্ট হবে তাও ভাল, তবু বেশী মজুরী দিয়ে তোমাকে কাজে লাগাতে চাইলে না। তারপর, যখন আবার একখানা জাহাজ ডুবী হলো, তখন কম মজুরীর ডুবুরী লাগাবার জন্য বিস্তর চেষ্টা কোরতে লাগলো, তবু বেশী মজুরী দিয়ে তোমাকে লাগালে না। কিন্তু যখন প্রাণের ভয়ে কোন ডুবুরীই ওই জায়গাটাতে ডুবতে রাজি হলো না, তখন দায়ে পড়ে বেশী মজুরী দিতে স্বীকার হয়ে, তোমাকে তার সামান্য একটা কাজে লাগিয়ে দিলে; তবু জাহাজখানা তোলবার বন্দোবস্ত তোমার সঙ্গে করলে না। ও জায়গাটা বড় ভয়ানক, একথা সকলেই জানে; যমের রাজত্ব বোল্‌লেও হয়। যদি তুমি কোনও রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে ওদের সামান্য কাজটুকু করে দিতে পার, তখন কম টাকায় অন্য ডুবুরীদের নামিয়ে দু'খানা জাহাজই তোলাবে এই হ'স মালিকদের মতলব। কেবল ডুবুরীদের মজুরী কমাবার মতলবেই এই বন্দোবস্ত কোরেছে। যে কাজে প্রাণ হাতের মুঠোতে নিয়ে

আমাদের লাগতে হবে, যে সাংঘাতিক কাজে প্রাণ যাবারই সম্ভাবনা বেশী, সেই ভয়ানক কাজেও যখন ওরা আমাদের মজুরী কমিয়ে নিজেদের লাভের চেষ্টা করছে, তখন ওদের মতো বড় মানুষের কাছে, আমাদের মতো গরীবের প্রাণের দাম কিছুই নেই, একথা বুঝ্‌তে পারছো তো ? কিন্তু, আমরা রাজি না হলে, ওরা কি সামান্য টাকায় আমাদের প্রাণ নিয়ে এ রকম ব্যবসায় করে বড় মানুষ হতে পারে ? এই যে তুমি প্রাণ দেবার কাজে চলেছ, তার জন্য এমন কি বেশী মজুরী ওরা দেছে ?”

নিকল্‌সন্ দুঃখের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল “কথাটা ঠিক ভাই, যে জায়গাতে জাহাজখানা ডুবেছে, ও জায়গায় নাম্‌তে এই টাকায় আমিও রাজি হতুম না। কিন্তু তোমরা জান বোধ হয় যে, আমার এক পরম বন্ধু ‘লিনো’ ওই জাহাজখানাতে চাকরী করতো। আমি কেবল তার লাশটাকে তোলবার আশাতেই এই কাজ নিয়েছি। আমি যদি আমার মরা বন্ধুর দেহটাকে তুলে এনে কবর দিতে পারি, তা হ’লে ওরা মজুরি না দিলেও আমার দুঃখ হবে না। খালি সেই আশাতেই আমি ওই সাংঘাতিক জায়গাতে নামতে রাজি হয়েছি, নইলে এ কাজ আমি নিতুম না।”

নিকল্‌সনের কথা শুনিয়া, ডুবুরিরা আর বাধা দিতে পারিল না বটে, কিন্তু তাহার দুঃসাহসের জন্য সকলেই চিন্তিত হইল। বুড়ো ডুবুরী একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল একথার ওপোরে আর আমরা কেউ তোমাকে মানা করতে, কি বাধা দিতে পারিনি, বরং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে, তোমার মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ

হোক। কিন্তু ওই জায়গাটাতে বিষম ভয়ের কারণ আছে বলে তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি—খুব হুঁসিয়ার হয়ে যেও। আচ্ছা, কতখানি জলের নীচে তোমাকে যেতে হবে তা জেনেছ কি ?"

"হ্যাঁ—প্রায় পঁয়ষট্টি ফিট জলের নীচে !"

"কি সর্ব্বনাশ—বল কি ! এ্যাঁ—পঁয়ষট্টি ফিট্—বাপ !"—বলিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া খানিকক্ষণ নিকল্‌সনের মুখের পানে নীরবে চাহিয়া রহিল। তারপর বুড়ো ডুবুরী বলিল—

"সাবধান নিকল্, হাঙ্গর-মারা ছোরা সঙ্গে নিতে ভুল না হয়। তা' ছাড়া—"

বাধা দিয়া নিকল্‌সন্ বলিয়া উঠিল—"ভয় নেই, এবার আমি ডুবুরির পূরো পোষাক পরেই নামবো ঠিক করেছি, তা' ছাড়া আমার 'পেভি'টার তিন দিকেই শানিয়ে ঠিক ক্ষুরের মতো ধার করে নিছি, এই দেখ !"—বলিয়া নিকল্‌সন্, আন্দাজ সাত আট ফিট লম্বা, বল্লমের মতো একটা অস্ত্র বাহির করিয়া দেখাইল। বল্লমটার বাঁট শক্ত কাঠে তৈয়ারী, এবং ফলটা দেখিতে অনেকটা বাটালির মতো। কিন্তু যেমন ছিল ভারি তেমনি চওড়াতেও ছয় ইঞ্চির কম নয়, তা' ছাড়া, তিন দিকেই তার ঠিক ক্ষুরের মতোই বিষম ধার।

[২]

ডুবুরীর ব্যবসায় করিয়া নিকল্‌সনের সাহস এমন বাড়িয়া-গিয়াছিল যে, সাধারণ কাজে সমুদ্রে ডুবিতে, সে ডুবুরীর পূরো

পোষাক এবং সীসার তলা-আঁটা ভারি বুট জুতা বড় একটা ব্যবহার করিত না। জলের পোকার মতো সহজভাবেই সমুদ্রে ডুবিয়া অনেকক্ষণ থাকিতে পারিত এবং জলের ভিতরে সাঁতার কাটিয়া মাংস-লোভী জলজন্তু শিকার করিতেও কসুর করিত না।

সেই নিকল্‌সন্ যখন ডুবুরীর পুরো পোষাক, বুটজুতা, 'পেভি' বল্লম এবং জলের ভিতরে ব্যবহারের ইলেকৃট্রিক মশাল প্রভৃতি লইয়া, খুব জাঁকজমকে প্রায় পঁয়ষট্টি ফিট জলের নীচে নামিবার জন্য প্রস্তুত হইল, তখন ডুবুরীর দল আর স্থির থাকিতে পারিল না। সকলে মিলিয়া তাহাকে উৎসাহ দিবার এবং সাহায্য করিবার জন্য তাহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া ডুবুরীদের জাহাজে উঠিল।

কিন্তু তারপর নিকল্‌সন্ ও তাহার সঙ্গীদের লইয়া তাহাদের জাহাজখানা যখন সেই প্রণালীর মুখে গিয়া ঠিক জায়গাতে দাঁড়াইল এবং কিছুমাত্র দেরী না করিয়া নিকল্‌সন্‌ও সমুদ্রে ডুবিবার জন্য পা বাড়াইল তখন বিপদের আশঙ্কা করিয়া নিকল্‌সন্‌কে বিদায় দিতে সকলেরই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। ছল-ছল চোখে তাহার হাত ধরিয়া নাড়িতে নাড়িতে বুড়ো ডুবুরী বলিল—নিকল্, প্রার্থনা করি, তুমি নিরাপদে কাজ হাসিল করে ফিরে এসো, ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করবেন। কিন্তু যদি সামান্য মাত্রও বিপদের কারণ দেখতে পাও, কি কোন রকম সন্দেহের কারণও ঘটে, তা' হলে কিন্তু বিন্দুমাত্রও দেরী করোনা, তখনি সঙ্কেতের দড়িটা ধরে নাড়া দিও। সকলেই আমরা তোয়ের হয়ে রইলুম, চোখের পলকে তোমাকে টেনে তুলে নেব।"

তারপর, একে একে সকলেই নিকল্‌সনের সঙ্গে সেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া তাহাকে বিদায় দিল। নিকল্‌সনও সকল বন্ধুগুলির কাছে বিদায় হইয়া মনে মনে ঈশ্বরের নাম লইয়া ফূর্‌তি করিয়াই সমুদ্রে ডুবিল। কিন্তু সকলেরই মন অমনি আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠায় ভরিয়া উঠিল। তাহারা এক মনে তাহার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতে করিতে, তটস্থ হইয়া বসিয়া রহিল দড়িগুলির কাছে।

নিকল্‌সন্ যেখানে ডুবিয়াছিল, তার দশ বার হাত আন্দাজ দূরে হঠাৎ কি একটা দেখিয়া একজন চীৎকার করিয়া উঠিল—"দেখ্ দেখ, ওখানে কি ওটা জলের ভিতর থেকে ক্রমেই ওপোরের দিকে ঠেলে ভেসে উঠ্‌ছে ?"

সকলেই একসঙ্গে সেই দিকে চাহিল, এবং কেহ কেহ চোখে দূরবীণ লাগাইতেও ছাড়িল না। কিন্তু ভাল করিয়া দেখিয়াও কেহ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল না যে সেটা কি ? পরক্ষণেই অনেকখানি জায়গায় জল তোলপার করিয়া উপরে না উঠিয়াই সে আবার অতলে অদৃশ্য হইয়া গেল। বুড়ো ডুবুরী বলিয়া উঠিল—"সমুদ্রের এই অঞ্চলটাকে যমের রাজত্ব বোল্‌লেও হয়। প্রকাণ্ড বড় বড় হাঙ্গর তো হামেশাই দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তা ছাড়া অক্টোপাশেরও অভাব নেই। আরও কত রকমের ভয়ানক ভয়ানক জল রাক্ষস যে ওৎপেতে শিকার ধরবার জন্য ঘুরে বেড়ায়, কে তার ঠিকানা কর্‌বে ; তাই এই জায়গাতে নামবার কথা মনে হলেই ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে।"

"আর কি দুর্জ্জয় সাহস আমাদের নিকলের—সে সচ্ছন্দে এই-খানে ডুবে সমুদ্রের তলায় কাজ কর্‌তে গেল ? এ তাঁর নিতান্তই নির্ব্বোধ গোঁয়ারের মত কাজ হয়েছে, কি বল তোমরা ?—বলিয়া একজন ডুবুরী অন্য সকলের মুখের পানে চাহিল কিন্তু কেহ কিছু জবাব করিবার আগেই বুড়ো ডুবুরী আবার বলিয়া উঠিল "সাহস বীরত্বের পরিচয় বটে কিন্তু যেখানে জীবন নষ্ট হবার সম্ভাবনাই পোনের আনার বেশী থাকে, তেমন জায়গাতে দুঃসাহস প্রকাশ করার চেয়ে মূর্খতা আর নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে নিকল্‌সন্‌কে দোষ দেওয়া যায় না। এক অতি মহৎ কর্ত্তব্যকে মনে রেখেই সে এ কাজে হাত দেছে। আমরা এখন কেবল তার উদ্দেশ্যের কথা মনে করে তার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। ভগবানের আশীর্ব্বাদে নিকল্‌সন যেন তার বন্ধুর দেহটাকে নির্ব্বিঘ্নে উদ্ধার করে আনতে পারে।"

নিশ্চয়, নিশ্চয় ! সেই আমাদের সকলেরই একমাত্র ঐকান্তিক প্রার্থনা। নইলে নিকল্‌সনের জীবন নষ্ট হলে আমাদের গৌরব করবার আর কিছু থাকবে না।

এই বলিয়া সকলেই মনে মনে ঈশ্বরের কাছে নিকল্‌সনের মঙ্গল প্রার্থনা করিল।

[৩]

জাহাজ হইতে সমুদ্রে নামিয়া নিকল্‌সন্‌ যখন বরাবর সমুদ্রের তলদেশে যাইতে লাগিল, তখন তার ইলেক্‌ট্রিক মশালের

আলো গোল লইয়া তাহার চারিদিকে অনেকখানি জায়গা পরিষ্কার দেখাইতেছিল। নিকল্‌সন্‌, সেই আলোর ভিতরকার জায়গায় ভয়ের কিছুমাত্র কারণ দেখিতে না পাইয়া নিশ্চিন্ত মনে ডুবো জাহাজখানার ডেকের উপরে গিয়া দাঁড়াইল।

জাহাজখানা বড় নয়, তার ভিতরে ক্যাবিন, কলকব্জা কি জিনিসপত্র বেশী ছিল না। নিকল্‌সন্‌ আলোটা হাতে লইয়া ভালো করিয়া জাহাজের কোণায় কি আছে, প্রথমে দেখিয়া লইল। কিন্তু কোথাও কোন মরা-মানুষের চিহ্ন পর্য্যন্ত তাহার নজরে পড়িল না।

প্রায় পনের মিনিট পর্য্যন্ত খুঁজিয়াও নিকল্‌সন্‌ যখন তাহার বন্ধুর দেহ দেখিতে পাইল না, তখন নিরাশ হইয়া একটা দুঃখের নিশ্বাস ফেলিয়া সে তার কাজে লাগিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

জাহাজের ডেকের মাঝামাঝি একটা কাঠের খুঁটির কাছে একটা সিন্দুক ছিল। জাহাজখানা বালি ও কাদায় বসিয়া ডেকটা সমুদ্রের তলার সমান হইয়া গিয়াছিল। নিকল্‌সন্‌ সেই খুঁটির গায়ে তার মশালটা ঝুলাইয়া বাঁধিয়া প্রথমে উবু হইয়া বসিয়া সিন্দুকের নীচের দিকটা ভালো করিয়া দেখিয়া লইল।

কিন্তু, তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া, তার সেই 'পেভি'-বল্লমটা লইয়া যেমন সে কাজে লাগিতে যাইবে, অমনি হঠাৎ তাহার নজর পড়িল—দশ বার হাত দূরে—মশালের আলোর রেখার শেষ সীমায়—আবছা অন্ধকারের ভিতর—কি একটা গোল আকারের সাদা জিনিসের উপর।

জিনিসটা হেলিয়া দুলিয়া নড়িতে নড়িতে তাহার দিকেই আসিতেছে দেখিয়া নিকল্‌সন্ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। জিনিসটা ক্রমে আলোর রেখার কাছাকাছি আসিতে কোন একটা প্রকাণ্ড মাছের পেট মনে করিয়া, নিকলসন্ বল্লম উঁঠাইয়া শিকারের জন্য প্রস্তুত:হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু, পরক্ষণেই হঠাৎ তার ভিতর হইতে একটা মানুষের মাথা বাহির হইতে দেখিয়া বিস্ময়ে ও ভয়ে নিকল্‌সন্ কাঁপিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মানুষটার দুই পাশে লম্বা দু'খানা হাত উঠিয়া পড়িয়া ক্রমেই মশালের আলোর ভিতরে আসিয়া পড়িল। নিকল্‌সন্ অবাক হইয়া দেখিল যে, মানুষটা চিৎ হইয়া শুইয়া বিষম ডাগর-ডাগর দুই চোখ একেবারে কান পর্য্যন্ত মেলিয়া ড্যাব্ ড্যাব্ করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে সুমুখের দিকে!

নিকল্‌সন্ কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। সেই অস্বাভাবিক ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে তাহার বুদ্ধি যেন উড়িয়া গেল। তাহাকে তুলিয়া লইবার জন্য সঙ্কেতের দড়ি ধরিয়া তাড়াতাড়ি গেল নাড়িয়া ইসারা করিতে।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বড়বড় দুটো গোল চোখ হইতে আগুনের মতো উজ্জ্বল ও তীব্র জ্যোতি ছড়াইয়া, ধূসর রংয়ের বেলুনের মতো—প্রকাণ্ড কি একটা—কে জানে কোথা হইতে মানুষটার কাছে আসিয়া পড়িল। জ্বলন্ত চোখ দুটোর নীচে ঈগলের মত ধারালো ও তেমনি শক্ত দুটো ঠোঁট নাড়িতে নাড়িতে বেলুনের আকারের সেই বিভীষিকাটা আলোর ভিতরে

আসিয়া পড়িতেই তার চেহারা দেখিয়াই নিকল্‌সন্ ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া চিনিল যে, সেটা একটা অতিকায় আকারের প্রকাণ্ড অক্টোপাশ।

সে অঞ্চলে নিকল্‌সন্ আরও অনেক ভয়ানক ভয়ানক যমের দোসর অক্টোপাশ দেখিয়াছিল, কিন্তু সমুদ্রের সেই মহা ভীষণ রাক্ষস যে অত বড় হইতে পারে, তাহা সে কখনো শুনে নাই, কি কল্পনাতেও ভাবিতে পারে নাই।

হঠাৎ নিকল্‌সন্ দেখিল যে, অজগরের মতো প্রকাণ্ড দুটো শুঁড় বাড়াইয়া সেই জল-রাক্ষস মানুষটাকে জড়াইয়া তার পেটের ভিতরে টানিয়া লইল এবং আর একটা তাদের চেয়ে লম্বা শুঁড় বাড়াইয়া চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল আর কোথায় কি আছে। নিকল্‌সন্ ভয়ে কাঠ হইয়া দেখিল শুঁড়ের তলার দিকটাতে হাজার হাজার চোখের মতো গোল গোল দাগ এবং সেই দাগগুলোর ভিতর হইতে তেমনি শত শত ধারালো ছুঁচের মতো তীক্ষ্ণ কাঁটা বাহির হইয়া মশালের আলোতে চক্‌মক্ করিতেছে!

মানুষটাকে পেটের ভিতরে দুই শুঁড়ে জড়াইয়া লইয়া অক্টোপাশটা স্থির হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তার আর একটা শুঁড় আসিয়া সাপের মতো কিল্‌বিল্ করিতে লাগিল নিকল্‌সনের অনেকখানি কাছে।

নিকল্‌সনের আর প্রাণের আশা রহিল না। মিনিটখানেকের জন্য সে একেবারে পাথরের মূর্ত্তির মতো কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল সেই দিকে। কিন্তু পরক্ষণেই সে

চম্‌কাইয়া দেখিল যে, অক্টোপাশটা নিসাড়ে তার দিকে আগাইয়া আসিতেছে, আর সেই শুঁড়টা আসিয়া পড়িয়াছে প্রায় তার মাথার উপরে।

আর বুদ্ধি স্থির করিবার সময় রহিল না। প্রাণের আশা ছাড়িয়া একেবারে মোরিয়া হইয়া নিকল্‌সন্‌ তার সেই 'পেভি' বল্লম তুলিয়া, চার-পাঁচ পা আগাইয়া গিয়াই সজোরে মারিল সেই লম্বা শুঁড়ের গোড়ার দিকে এক ঘা। বল্লমটা কিন্তু সেখানে না লাগিয়া পড়িল গিয়া যে দুটো শুঁড়ে মরা মানুষটাকে অক্টোপাশ জড়াইয়াছিল, তার একটা শুঁড়ের গোড়াতে।

শুঁড়টা তখনি সেই সাংঘাতিক অস্ত্রে কাটিয়া অক্টোপাশের গা হইতে আলগা হইয়া গেল। তবুও সে মরা মানুষটাকে ছাড়িল না। তাকে তেমনি জড়াইয়াই কাদায় পড়িয়া সাপের মতো কিল্‌বিল্‌ করিতে লাগিল।

নিকল্‌সন তাড়াতাড়ি বল্লমটাকে আবার উঁচাইয়া তার মাথার উপরের শুঁড়টাকে কাটিতে গেল। কিন্তু তার আগেই নীচের দিক্‌ হইতে আর একটা শুঁড় বাহির হইয়া তার বাঁ পাখানাকে জড়াইতে জড়াইতে এমন জোরে অক্টোপাশের দিকে টানিতে লাগিল যে, পুরু রবার ও খুব মোটা ক্যাম্বিশে তৈয়ারী ডুবুরীর পোষাক এবং সেই বিষম ভারি বুট জুতা পরা না থাকিলে তার পাখানা ছিঁড়িয়া যাইত।

নিকল্‌সন্‌ প্রাণপণে নিজকে সামলাইবার চেষ্টা করিয়াও পারিল না। অক্টোপাশ একটু একটু করিয়া তাহাকে কাছে

টানিতে লাগিল। বিষম জোরে বল্লম তুলিয়া নিকল্‌সন্ তাড়াতাড়ি মারিল সেই শুঁড়টার উপর। কিন্তু বল্লমটা শুঁড়ে না লাগিয়া পড়িল গিয়া জাহাজের ডেকের উপরে। সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রটা ডেকের কাঠ ফুঁড়িয়া ভিতর দিকে বসিয়া গেল।

নিকল্‌সন্ প্রাণপণ শক্তিতে টানিয়া বল্লমটা তুলিল বটে, কিন্তু তার আগেই অক্টোপাশটা আর একটা শুঁড় বাড়াইয়া বল্লম শুদ্ধ তার বাঁ হাতখানাকে জড়াইতে গেল। নিকল্‌সন্ ডান হাতে অতি কষ্টে বল্লমটাকে রক্ষা করিল বটে, কিন্তু নিজের বাঁ হাতখানাকে রক্ষা করিতে পারিল না। চোখের পলকে অক্টোপাশ তার বাঁ হাতখানাকে শুঁড়ে জড়াইয়াই মুখ দিয়া কালির মতো এমন একটা লালা ছাড়িয়া দিল যে, দেখিতে দেখিতে সে জায়গাটা একেবারে অন্ধকার হইয়া গেল। নিকল্‌সন্ আর চোখে কোনদিকে কিছুমাত্র দেখিতে পাইল না।

কিন্তু ঈশ্বর রাখিলে কেহই মারিতে পারে না। জল অন্ধকার হইলে নিকল্‌সন্ যখন চোখে আর কিছু দেখিতে পাইল না, তখন সে নিরুপায় হইয়া ‘পেভি’ বল্লমটাকে উঁচু করিয়া তুলিয়া, জোরে জোরে নাড়িতে লাগিল নিজের মাথার উপরে।

নিকল্‌সনের ভাগ্যক্রমে সেই সময়েই উপর দিক হইতে অক্টোপাশের সেই শুঁড়টা নামিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিতে যাইতেছিল। হঠাৎ পেভিটার পাশের দিকে জোরে লাগিয়া শুঁড়টা প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় কাটিয়া পড়িয়া গেল এবং

ক্রমাগত বল্লমের নাড়ায় কালো জল সরিয়া গিয়া মশালের আলোকও ফুটিয়া উঠিতে লাগিল একটু একটু করিয়া।

বরাতের জোরে তেমন অবস্থাতেও বাঁচিয়া গিয়া নিকল্সনের মনে আশা জাগিল, সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি এবং গায়ের জোরও যেন বাড়িয়া গেল অনেকখানি। নিকল্সন্ বুঝিল যে, যে ভাবে রাক্ষসটা তার দুটো বিষম ধারালো, হাজার হাজার কাঁটাওয়ালা শুঁড় দিয়া তার বাঁ পা এবং হাতখানাকে হাতীর মতো জোরে জড়াইয়া ক্রমাগত টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাতে ডুবুরীর মোটা ও শক্ত পোষাকটা পরা না থাকিলে, তার হাত ও পায়ের সমস্ত মাংস ছিঁড়িয়া হাড় বাহির হইয়া পড়িত — কিন্তু তবুও সে হাতটা ছাড়াইবার অন্য উপায় না দেখিয়া পোষাকের মায়া ছাড়িয়া দিল।

আস্তে আস্তে ডান হাতে "পেভি"-বল্লমটার ফলার কাছে শক্ত করিয়া ধরিয়া, নিকল্সন্, বাঁ হাতের বগলের ভিতরে বল্লমটা চালাইয়া দিল এবং প্রাণপণ শক্তিতে পোষাকের জামাটা শুদ্ধ অক্টোপাশের শুঁড়টা কাটিয়া বাঁ হাতখানাকে বাহির করিয়া লইল। কাটা শুঁড়টার খানিকটা নীচে পড়িয়া গেল, বাকীটা জামাতে তেমনি জড়াইয়াই ঝুলিতে লাগিল তার পোষাকের সঙ্গে।

কিন্তু সেই সময়, অক্টোপাশটা হঠাৎ কেমন করিয়া যে নিকল্সনের ফিট তিনেক তফাতে একেবারে গায়ের কাছে আসিয়া পড়িল, তা সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। তার

বিষম জ্বলন্ত বড় বড় চোখ দুটো নিকল্‌সনের চোখের উপরে স্থির রাখিয়া এমন ভাবে চাহিতে লাগিল যে, দেখিবামাত্র নিকল্‌সনের মাথা ঘুরিয়া গেল। প্রায় অজ্ঞানের মতো হইয়া সে চোখের পলকে বল্লমটা তুলিয়া ,দু'হাতে ধরিয়া সজোরে বসাইয়া দিল রাক্ষসটার ঠোঁটের নীচে। তারপরেই দু'হাতে বল্লমের বাঁট ধরিয়া, এমন ভাবে ঘুরাইয়া উপর দিক দিয়া তুলিয়া লইল যে, সেই সর্ব্বনেশে চোখ দুটোর সঙ্গে সঙ্গে উপরের ঠোঁটখানা অবধি কাটিয়া গিয়া পিছন দিকে ঝুলিয়া পড়িল। ভগবানের নাম লইয়া, নিকল্‌সন্ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল বটে, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত যুদ্ধ শেষ হইল না।

অক্টোপাশটার উপরের দিকটা কাটিয়া গেলেও হঠাৎ আর একটা শুঁড় বাহির হইয়া নিকল্‌সনের কোমর জড়াইয়া ধরিতে সুরু করিল। নিকল্‌সন্ তাড়াতাড়ি সেই শুঁড়টার গোড়ার দিকে বল্লম বসাইয়া কাটিয়া ফেলিল। কিন্তু কাটা শুঁড়ের আধখানাকে কিছুতেই খুলিতে পারিল না কোমর হইতে।

তারপর নিকল্‌সন্, পায়ে জড়ানো শুঁড়টাকেও গোড়ার দিকে কাটিয়া অক্টোপাশের গায়ের মাঝামাঝি আবার দিল বল্লম বসাইয়া।

এমনি করিয়া অক্টোপাশের আটটা শুঁড়ই কাটিয়া সে যখন তাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল, তখন আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে, মরা মানুষটাকে শক্ত করিয়া জড়াইয়া রাখিয়া কাটা শুঁড়টা তখন পর্য্যন্ত সাপের মত আঁকিয়া-বাঁকিয়া নড়িতেছে। বহুকষ্টে

এবং অশেষ চেষ্টায় মরা মানুষটাকে টানিয়া আনিয়া জাহাজের উপরে বাঁধিয়া রাখিয়া সে সঙ্কেতের দড়ি ধরিয়া জোরে জোরে নাড়িল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর্য্যন্ত নিকল্‌সনের সাড়া না পাইয়া, এক সঙ্গে তিনজন ডুবুরী সমুদ্রে ডুবিবার জন্য তৈয়ার হইতেছিল। এমন সময়ে ইসারা পাইয়া তাহারা যখন নিকল্‌সনকে জাহাজের উপরে টানিয়া তুলিল তখন তার হাতে পায়ে এবং কোমরে জড়ানো অক্টোপাশের কাটা শুঁড় তিনটা দেখিয়া ভয়ে আর কাহারও মুখে কথাটি পর্য্যন্ত সরিল না।

শুঁড়ের বাঁধনে নিকল্‌সনেরও প্রাণ অর্দ্ধেক শেষ হইয়া গিয়াছিল। তিন-চারজনে একসঙ্গে মিলিয়া, প্রাণপণে জোরে টানিয়া টানিয়া শুঁড় তিনটাকে এক এক করিয়া খুলিয়া ডুবুরীরা যখন জাহাজের উপরে ফেলিল, তখন পর্য্যন্ত সেগুলো সাপেরমতো আঁকিয়া-বাঁকিয়া নড়িতেছিল। মাপিয়া সকলে অবাক হইয়া দেখিল যে দুটো শুঁড় আঠারো এবং তৃতীয়টা চৌদ্দ ফিটের কম নয়।

ঘণ্টা দুই বিশ্রামের পরে নিকল্‌সন্ আবার নামিয়া সেই মরা মানুষটাকে তুলিয়া আনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে, সে তাহারই সেই বন্ধু লিনো। ঈশ্বর তাহার সাহস ও মহত্ত্বের পুরস্কার দিয়াছেন।

বাঘের বছর

[১]

বরিশাল জেলার ভিতর সুন্দরবনের অনেক জায়গা কাটিয়া চাষ আবাদ সুরু হইলেও, তখন পর্য্যন্ত চারিদিকে বন-জঙ্গলের অভাব ছিল না। তখনও জলে কুমীর এবং ডাঙ্গায় বাঘের ভয়ে সহরের আশ-পাশের গাঁয়ের লোকেরা সর্ব্বদাই সাবধান হইয়া চলা-ফেরা করিত। সেই সময় সরকারী কাজে বদলি হইয়া একজন শিকারী বাঙ্গালী ম্যাজিষ্ট্রেট যখন সে অঞ্চলে গেলেন, তখন লোকের ভরসা অনেকখানি বাড়িয়া গেল।

বাঙ্গালী হইলেও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যেমন বলবান্ তেমনি ছিলেন সাহসী। তার উপর, নানা জায়গায় বুনো মহিষ, বরা, বাঘ, ভালুক প্রভৃতি মারিয়া শিকারী বলিয়া যেমন বিখ্যাত হইয়াছিলেন তেমনি বড় বড় জানোয়ার শিকার করিবার ঝোঁকও তাঁর বাড়িয়া গিয়াছিল খুব বেশী। সেই জন্য শিকার করিবার আয়োজনও ছিল তাঁর কম নয়।

কিন্তু সে অঞ্চলে গিয়া প্রথম প্রথম দিনকতক যখন তিনি শিকারের সন্ধানে বাহির হইয়াও বাঘ-ভালুকের দেখা না পাইয়া নিরাশ হইয়া পড়িলেন, সেই সময়, হঠাৎ একরাত্রে কাছের একটা গাঁয়ে বিষম চীৎকার ও হট্টগোলের সঙ্গে সঙ্গে—কাঁসর, ঘণ্টা ও টিন-পেটার শব্দে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

সাহেব তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন, রাত্রি প্রায় ভোর হইয়া আসিয়াছে। একজন শিকারীকে আরদালী করিয়া তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন। তাহাকে জাগাইয়া ডাকিয়া আনিয়া হুকুম করিলেন—"খবর নিয়ে আয়, ঐ গোলমাল কিসের?"

সাহেবের বাংলার চারিধারে বড় বড় গাছে ভরা অনেকখানি ফাঁকা জায়গা ছিল। তারই এক ধারে একটা খড়ের ঘরে তিন-চার জন অন্য চাকরের সঙ্গে আরদালিও থাকিত। সাহেবের ডাকাডাকিতে সকলে জাগিলেও, আরদালি বাহির হইয়া যাইবার পরে তাহারা আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

সাহেবের ডাক শুনিয়া আরদালি তাড়াতাড়ি ঘুমের চোখেই উঠিয়া আসিয়াছিল, আশ-পাশে নজর করে নাই। হুকুম পাইয়া তৈয়ারী হইবার জন্য সে আবার তাহার ঘরে ঢুকিতে গেল। কিন্তু কাছাকাছি গিয়া—হঠাৎ কি দেখিয়া—একটু অস্ফুট চীৎকার করিয়াই সে আবার ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বাংলাতে ফিরিয়া আসিয়াই হাঁপাইতে হাঁপাইতে ডাকিল—"হুজুর!"

আরদালিকে হুকুম দিয়া সাহেব আবার ঘরের ভিতরে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া আশ্চার্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি—কি হয়েছে?"

আরদালি একটা গাছের দিকে ফিরিয়া তেমনি জড়ানো গলায় বলিল—"ওই দেখুন হুজুর, ঐ গাছ তলাটাতে কি?"

নিবন্ত চাঁদের আলোতে সে জায়গাটা আব্‌ছা অন্ধকারে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। সাহেব নজর করিয়া দেখিলেন—বাস্তবিকই
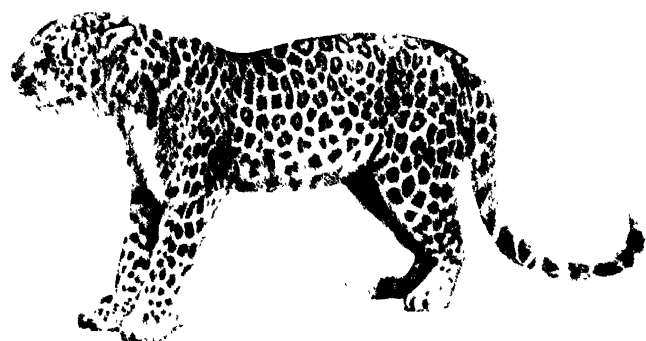
কা'র দুটো গোল গোল চোখ যেন আগুনের মত দপ্ দপ্ করিতেছে। আরদালিকে নিঃশব্দে নজর রাখিতে বলিয়াই, সাহেব তাড়াতাড়ি বন্দুক আনিবার জন্য ঘরের ভিতরে গেলেন।

কিন্তু বন্দুক লইয়া ফিরিয়া আসিয়া, আর সে চোখ দুটোকে দেখিতে পাইলেন না। আরদালি দেখাইয়া দিল বাংলার সীমানার বাহিরে নদীর ধারে কি একটা কুকুরের মত বড় জানোয়ার চলিয়া যাইতেছে।

আলো-আধারের ভিতর দিয়া সাহেব, অস্পষ্ট দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—"গায়ে যেন লম্বা লম্বা কালো ডোরা দাগ দেখা যাচ্ছে! বাঘ হওয়াই সম্ভব, বড় পলালো আজ।"

সকাল হইতেই, গ্রামের দশ-বার জন লোক একজন জখমী মানুষকে লইয়া সাহেবের কাছে আসিয়া বলিল—"কাল রাতে বাঘে একটা গাইকে টেনে নিয়ে গেছে হুজুর, তাকে বাঁচাবার চেষ্টায় বেরিয়ে এ লোক কি রকম জখম হয়েছে দেখুন। নেহাৎ বরাতের জোর, কোন রকমে প্রাণটা বেচে গেছে শুধু।"

সাহেব তখনি জখমী লোকটিকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিয়া নিজে তাহাদের সঙ্গে গ্রামে গিয়া সেখানকার অবস্থা দেখিয়া আসিলেন। তারপর সেই দিন রাত্রে বন্দুক এবং তাঁহার শিকারী আরদালিকে সঙ্গে লইয়া সেই গ্রামে গিয়া একটা জায়গা পছন্দ করিয়া বাঘের আশাতে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

কিন্তু, সে রাত্রে বাঘ তো আর আসিলই না, তারপরেও তিন-চারদিন তেমনি করিয়া রাত জাগিয়া বসিয়া থাকিয়াও সাহেব

বাঘের দেখা পাইলেন না। অথচ ঘরে ফিরিয়া তিনি প্রায় রোজই সকলের মুখে শুনিতে লাগিলেন যে, নিত্য গভীর রাত্রে কি একটা জানোয়ার—কেমন এক রকম অদ্ভুত শব্দ করিতে করিতে বাংলার সীমানার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়।

সপ্তাহখানেক পরে, সাহেব একদিন রাত্রে ঘরে জাগিয়া থাকিয়া স্বকর্ণে শুনিলেন, কে যেন জোর নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে 'ঘ্যাঃ-ঘ্যাঃ' শব্দ করিতে করিতে বাংলার পিছন দিয়া যাইতেছে।

বাংলার পিছন দিকে অনেকখানি পড়ো জমি ঝোপ-জঙ্গলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। সাহেবের মনে হইল যে, সেই আশ্চর্য্য শব্দটা যেন সেইদিকে যাইতে যাইতে ক্রমে মিলাইয়া গেল।

পরের দিন দুপর বেলাতে, একেলা বন্দুক লইয়া তিনি ঢুকিলেন গিয়া সেই জঙ্গলের ভিতরে।

[২]

জঙ্গলের শেষে একটা বড় খাল ক্রমেই চওড়া হইয়া নদীতে গিয়া পড়িয়াছিল। খালের দুই তীরেই হোগলার ঘন জঙ্গল অনেক জায়গাতেই জলের ভিতর পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেই হোগলার জঙ্গলের মাঝে মাঝে অল্প-স্বল্প করিয়া ফাকা জায়গাও যে না ছিল এমন নয়, এবং বনের ভিতর দিয়া মানুষ চলাচলের অস্পষ্ট একটা পথের দাগ সেই সব ফাঁকা জায়গাগুলিতে আসিয়া মিশিয়াছিল। তাহাতেই সাহেব বুঝিলেন যে সেই জঙ্গলের ভিতরে লোক যাওয়া-আসা করিয়া থাকে।

বনের ভিতর ঘুরিতে ঘুরিতে, খালের ধারে তেমনি একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়া দাঁড়াইতেই, সাহেব হঠাৎ অপর পার হইতে বাতাসের সঙ্গে একটা বোট্‌কা গন্ধ পাইলেন। তখনি তিনি বন্দুক তুলিয়া প্রস্তুত হইলেন বটে, কিন্তু সেপারে যাইবার উপায় ছিল না বলিয়া সেই দিকের হোগলা বনের উপরে নজর রাখিয়া এ পার দিয়াই বরাবর আগাইয়া নদীর দিকে যাইতে লাগিলেন।

হঠাৎ সামনের দিকে অপর পারে অল্প দূরেই হোগলার জঙ্গলের একটা ফাঁকে তাঁহার নজর পড়িল। তাঁহার মনে হইল চাষাদের মাথার শালপাতার বড় গোল আকারের টুপির 'পাত্‌লার' যেন কি একটা পড়িয়া রহিয়াছে। আশ্চর্য্য হইয়া ভাল করিয়া দেখিবার জন্য সাহেব হোগলার জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে লাগিলেন।

দুপরের রোদ প্রখর হইয়া উঠিলেও, আকাশে মেঘ করিয়া মাঝে মাঝে সূর্য্যকে যেমন একেবারে ঢাকিয়া ফেলিতেছিল, তেমনি জোরে জোরে এক-একটা দম্‌কা বাতাসে হোগলার জঙ্গল বেগে দুলিয়া 'সর্‌-সর্‌' শব্দে চারিদিক ভরাইয়া দিতেছিল। সঙ্গে-সঙ্গে সেই বোট্‌কা গন্ধও বেশী হইয়া সাহেবের নাকে আসিয়া ঢুকিতে লাগিল। তখন সাহেবের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, ওপারে—কাছেই কোথাও নিশ্চয়ই বাঘ—কি সেই রকমেরই কোন ভয়ানক জানোয়ার লুকাইয়া আছে।

কিন্তু সেই সাদা পাতলার মত জিনিসটা কি এবং কেনই বা

তেমন অবস্থায় সেখানে পড়িয়া আছে, তাহা জানিবার জন্য সাহেব সেই দিকেই দৃষ্টি স্থির রাখিয়া চলিলেন।

সাহেবের মনে নানা রকম সন্দেহ জাগিতে লাগিল। কিন্তু খানিকটা আগাইয়া যাইতেই হোগলা-জঙ্গলের ফাঁক দিয়া অস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যেন একটা মানুষ সেই টুপি মাথায় দিয়া একমনে খালে ছিপ ফেলিয়া বসিয়া আছে।

সাহেব আরও একটু আগাইয়া গিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার সন্দেহ সত্য বটে, কিন্তু মানুষটা যে বাঘের গন্ধ পাইয়াও তেমন নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া মাছ ধরিতেছে, তাহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। অন্যমনস্ক হইয়া থাকিবার জন্য কিংবা বাঘের গন্ধ পায় নাই স্থির করিয়া সাহেব তাহাকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য আরও খানিক আগাইয়া চীৎকার করিয়া তাহার বিপদ্ জানাইয়া দিতে গেলেন।

ঠিক সেই মুখেই একটা বিষম দম্‌কা বাতাসে, তাঁহার সুমুখের হোগলা গাছের ডগাগুলা প্রায় শুইয়া পড়িয়া লোকটাকে স্পষ্ট দেখাইয়া দিল। সাহেব চেঁচাইয়া তাহাকে সাবধান করিবেন কি,—নিজেই পা পিছ্‌লাইয়া উপুড় হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু তিনি সাম্‌লাইয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতেই, দ্বিগুণ জোরে আর একটা দম্‌কা বাতাস আসিয়া সেই লোকটার মাথার টুপিটাকে হঠাৎ উড়াইয়া খালের জলে ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে সাহেব হতভম্ব হইয়া দেখিলেন, একটা মাঝারি রকমের

ডোরা বাঘ মানুষটার পাশের দিক হইতে শূন্যে লাফাইয়া তাহার মাথার উপর দিয়া গিয়া ঝপাং করিয়া পড়িল জলের ভিতরে—টুপিটার উপরে। মানুষটাও 'বাপ্' বলিয়াই চম্‌কাইয়া বিষম ভয়ে কাঠ হইয়া দাঁড়াইল।

সাহেব তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাঘটাকে গুলি করিতে গেলেন। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই, প্রকাণ্ড একটা কুমীর—কে জানে কোথা হইতে ভয়ানক একটা লেজের ঝাপ্‌টা মারিয়াই বাঘের পাছার দিক্‌টা প্রায় সমস্তই মুখে পূরিয়া ধরিল।

ওপারের লোকটার মত—সেই আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া সাহেবও এপারে মিনিটখানেকের জন্য অবাক্ হইয়া দাঁড়াইলেন। তার পরক্ষণেই বন্দুক ছুঁড়িলেন—গুড়ুম্!

গুলিটা বাঘ কি কুমীর কাহারও গায়ে লাগিল কিনা তিনি তা বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খালের জল বিষম জোরে তোলপাড় হইয়া উঠিল।

সাহেব আবার গুলি করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন যে, দু'জনেই জলের ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেছে!

[৩]

দিন পনের পরে—ক্রোশ দুই দূরে—নদীর ধারের একটা জঙ্গলের ভিতরে একটা বড় ডোরা বাঘের সাড়া পাইয়া সে অঞ্চলের চাষারা আসিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে জানাইল।

খবর শুনিয়াই সাহেব তাঁহার শিকারী আরদালিকে সঙ্গে

লইয়া সেইখানে গেলেন বটে, কিন্তু সেই বনের ভিতর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও, কোথাও বাঘের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলেন না।

জায়গাটা একটা ছোটখাটো দ্বীপের মতো, চারিদিকেই নদী ও খালে ঘেরা। ভিতরে কতকগুলো বড় বড় গাছ ছাড়া, ঝোপ-জঙ্গল নাই বলিলেও চলে; কিন্তু চারিদিকেই জলের ধারে ধারে হোগলা আর কাঁটা ঝোপের ঘন জঙ্গল। জনকতক চাষা বলিল—"হুজুর, নদী আর খাল সাঁত্‌রে পার হয়ে, বাঘগুলিকে ওই জঙ্গলে গিয়ে ঢুক্‌তে আমরা প্রায়ই দেখ্‌তে পাই। আজও ভোরের বেলাতে একটা প্রকাণ্ড বাঘকে ওই দিকের খালটা সাঁত্‌রে পেরিয়ে ওই জঙ্গলে ঢুক্‌তে দেখেছি। তাতেই হুজুরকে খবর দিয়েছিলুম।"

আরদালি চাষাদের কথা শুনিয়া সাহেবকে বলিল—"ওই জায়গাটাতে শিকারের সুবিধা আছে বটে হুজুর, যে কটা বড় বড় গাছ দেখা গেল, তার ওপোরে উঠেই শিকার করা চল্‌তে পারে। ঝোপ-জঙ্গল বেশী নেই, মাচা বাঁধবার দরকার হয় না। এদের কথার ভাবে বোধ হয়—এখানটাতে বাঘের বহর থাক্‌তে পারে। তাড়া খেয়ে, কি শিকার ধরে এনে, ব্যাটারা ওই জায়গাটাতে খায়। হাড়ের তো অনেক ছড়াছড়ি।"

চাষারা সায় দিয়া বলিয়া উঠিল—"ওনার কথাই ঠিক্ হুজুর! এখন আপনারা দেখ্‌তে পেলেন না বটে, কিন্তু ওই জায়গাটাতে এসে নিশ্চয় তারা থাক্‌বে। আমরা প্রায়ই দেখ্‌তে

পাই হুজুর। সেইজন্যই অনেক মানুষ না জুট্‌লে, ভয়ে এই ক্ষেতগুলোতে কেউ চাষ কর্‌তে ভরসা করে না।"

চাষাদের কথা শুনিয়া, সাহেব একটা ছাগল কিনিয়া লইয়া আবার সেই বনে গিয়া একটা জায়গায় শক্ত করিয়া বাধিয়া আসিয়া কহিলেন—"আমরা এখন চল্‌লুম। তোমরা চৌকি দাও। যদি ওখানে বাঘের আনাগোনা থাকে, তা' হলে ছাগলের লোভে নিশ্চয় আসবে। নদী কি খাল পেরিয়ে ওই জঙ্গলে বাঘ ঢুক্‌তে দেখ্‌লেই, আমাকে খবর দিও।"

চাষাদের চৌকি দিতে লাগাইয়া দিয়া সাহেব নিজের বোটে উঠিয়া ঘরের দিকে ফিরিয়া চলিলেন। কিন্তু মাইলখানেক যাইবার পরে, নদীর একটা বাক ফিরিতেই হঠাৎ দেখিতে পাইলেন—অনেকখানি দূরে বাস্তবিকই একটা বাঘ নদী সাঁত্‌রাইয়া সেই জঙ্গলের দিকেই চলিয়াছে।

সাহেবের আর ঘরের কথা মনে রহিল না। তখনি বোট ফিরাইয়া আবার সেইখানে গিয়া উঠিলেন। তারপর চাষাদিগকে ডাকিয়া উপস্থিত মত উপদেশ দিয়া আরদালিকে লইয়া গিয়া ঢুকিলেন সেই বনের ভিতরে।

হঠাৎ ছাগলটার ঘন ঘন চীৎকারের স্বর কানে গেল। দু'জনে তাড়াতাড়ি সেইখানে গিয়াও কিন্তু বাঘ দেখিতে পাইলেন না, অথচ ছাগলের অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল যেন সে অত্যন্ত ভয় পাইয়াছে। আরদালি কহিল—"হুজুর, ওই উঁচু গাছটাতে উঠে আমি দেখি বাঘটা কোন্ দিকে; আপনি তোয়ের

হ’য়ে থাকুন।”—বলিয়াই আরদালি একটা উঁচু গাছের উপরে উঠিয়া গেল। ঠিক সেই সময়ে পাশের দিকে অল্পদূরেই একটা কাঁটা ঝোপের ভিতর হইতে কেমন এক রকম ঈষৎ শব্দ উঠিল।

সাহেব একটা মুড়া কুল গাছের নীচে দাঁড়াইয়াছিলেন। ভালো করিয়া ঝোপটার ভিতর দেখিবার জন্য তিনিও তাড়াতাড়ি উঠিতে গেলেন সেই কুলগাছটার উপরে। ঠিক সেই সময়ে বাঘটাও হঠাৎ বাহির হইয়াই একটা আহ্লাদের গর্জ্জন করিয়া এক লাফে গিয়া দাঁড়াইল কুল গাছের নীচে।

সাহেব তাড়াতাড়ি কুলগাছের উপর উঠিয়াই বন্দুক লইয়া গেলেন গুলি করিতে। কিন্তু বাঘটা যেন তাঁর মতলব বুঝিয়াই এমন বিদ্যুতের মত চারিদিকে ছুটোছুটি করিতে সুরু করিল যে, দু’জনের কেহই লক্ষ্য স্থির করিতে পারিলেন না।

কিন্তু আশ্চর্য্য যে, বাঘটা ছাগলের দিকেও ঘেঁসিল না। কেবলই কুলগাছটার চারিদিকে ছুটোছুটি করিতে করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল—লাফাইয়া সাহেবকে ধরিবার জন্য।

প্রায় মিনিট দশেক তেমনি চেষ্টা করিয়াও, সাহেবকে ধরিতে না পারিয়া, বাঘটা আচম্‌কা কুলগাছের নীচে গিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াই দুইহাতে এমন জোরে গাছটাকে ধরিয়া নাড়িতে লাগিল যে, সাহেব আর কিছুতেই গাছের উপর থাকিতে পারিলেন না।

সেই সুযোগে আরদালিও বাঘকে নিশানা করিয়া বন্দুক ছুড়িল এবং ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বাঘের বিষম নাড়ায় সাহেবও হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া গেলেন তারই গায়ের উপর।

আরদালির গুলি লাগিয়া বাঘটা তখনি মরিল বটে, কিন্তু সাহেবের হাঁটুর উপরে একটা থাবা মারিতে ছাড়িল না। সাহেবের পোষাক ছিঁড়িয়া তাঁহার হাঁটু বিষম ছিঁড়িয়া গেল।

সাহেব কিন্তু উৎসাহে মাতিয়া তখন সে ক্ষত গ্রাহ্য করিলেন না। চাষারা আসিয়া বাঘটাকে মাপিয়া আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে, লম্বায় সে পাঁচ হাতের কম নয়।

সাহেব তখন হাঁটুর ঘা গ্রাহ্য করিলেন না বটে, কিন্তু তাহাতেই মাসখানেকের ভিতরে তাঁহার মৃত্যু হইল।

মরণের গ্রাসে

[১]

বাঘ-ভালুকে ভরা পাহাড়-জঙ্গলের ভিতর এবং ধার দিয়া রেল যাইবার পরে, রেল-লাইনের কাছাকাছি মানভূম জেলার অনেক নির্জ্জন জায়গাতেই বন কাটিয়া মানুষের ছোটখাটো বসতি হইয়াছিল। সে সকল বস্তিতে ভদ্রলোক না থাকিলেও, যারা বাস করিত, তারা সাহসী যেমন, তেমনি নানা কাজ এবং ব্যবসায় উপলক্ষে ভদ্রসমাজে যাওয়া আসা করিতে বাকী রাখিত না।

এই সকল বস্তির অনেকেই রেলে কুলির কাজ করিত আর বেশীরভাগ লোকই ছাগল, ভেড়া, শূকর, মুরগী এবং কেউ কেউ গরু মহিষের কারবার পর্য্যন্ত করিত। সেইজন্য রেলের ঠিকাদার

এবং শিকারী সাহেব-সুবা দু'চার জনও বস্তির কাছাকাছি রেল-লাইনের ধারে নির্জ্জন জায়গাতে কুঠীও যে না করিয়াছিলেন এমন নয়।

তেমনি একটা বস্তির মাইলখানেক দূরে একটা ছোট ষ্টেশনের কাছাকাছি এক ঠিকাদার সাহেব আসিয়া কুঠী করিয়া চাষ-আবাদের চেষ্টায়, অনেকখানি জায়গার বন্দোবস্ত লইয়া ক্রমেই বন কাটাইতে সুরু করিয়াছিলেন।

সাহেবের বাংলার আশে-পাশে কিছু জায়গা পরিষ্কার হইলেও তখন পর্য্যন্ত চারিদিকে বন ছিল যথেষ্ট, আর সেই সব বনে বাঘ-ভালুকের ভয়ও কম ছিল না। সেইজন্য, সন্ধ্যার আগেই বস্তির লোকেরা তাদের ছাগল-ভেড়াগুলিকে খোঁয়াড়ে পূরিয়া বন্ধ করিয়া রাখিত। তবুও মাঝে-মাঝে বাঘ আসিয়া কেমন করিয়া যে পশুগুলিকে লইয়া পলাইত তা কেহই স্থির করিতে পারিত না। শিকারী বলিয়া বস্তির লোকেরা, সাহেবের কাছে ছুটিয়া গিয়া সেই খবর জানাইত। সাহেবও বন্দুক এবং লোক সঙ্গে লইয়া বনে বনে ঘুরিয়া, বাঘ ভালুক মারিবার চেষ্টা করিতে কসুর করিতেন না।

সাহেবের দুইটা শিকারী কুকুরও ছিল। দিনের বেলা কুকুর দুটো বাঁধা থাকিত, কিন্তু সন্ধ্যার পরে কুকুর দুটোকে ছাড়িয়া দিয়া, সাহেব যখন বাংলার ভিতরে চলিয়া যাইতেন, তখন হইতে সারারাত্রির ভিতরে তাহাদের বিক্রমে কাহারও আর বাংলার কাছে ঘেঁসিবার যো থাকিত না।

একদিন বিকালে কালো মেঘে আকাশ অন্ধকার হইয়া সন্ধ্যা হইতেই বৃষ্টি সুরু হইল। সাহেবও লোকজনকে বিদায় করিয়া কুকুর দুটোকে ছাড়িয়া দিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

বৃষ্টি কিন্তু সারা রাত্রের ভিতরেও থামিল না, কুকুর দুটোও অন্য রাত্রের চেয়ে কিছু বেশী রকম চীৎকার করিতে লাগিল। সাহেব দুইবার বন্দুক লইয়া উঠিয়া, বাহিরে চারিদিকে ভাল করিয়া দেখিয়া গেলেন। তারপর একবার বৃষ্টি খুব জোরে আরম্ভ হইতেই তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। কুকুরের জোর ডাকেও তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিল না।

সকালে কিন্তু একটা কুকুরের বিকট চীৎকারে হঠাৎ তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখনও বৃষ্টি টিপ্‌টিপ্‌ করিয়া পড়িতেছিল। কুকুরের সেই রকম চীৎকারে আশ্চর্য্য হইয়া, তাড়াতাড়ি উঠিয়া তিনি বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র কুকুরটা উৎসাহে চীৎকারের মাত্রা দ্বিগুণ বাড়াইয়া, তাঁহার কাছে আসিবার জন্য ঝাপাঝাপি করিতে লাগিল। কিন্তু আর একটা কুকুরকে না দেখিয়া সাহেব যেমন আশ্চর্য্য হইলেন, অমনি তাহার খালি শিকলটা পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, সন্দেহ ভরে ডাকিতে লাগিলেন—'জ্যাক' জ্যাক !'

সাহেবের চাকর ছিল অনেকগুলি। তাঁহারা সাড়া পাইয়াই দুই-তিন জন ছুটিয়া আসিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল—'জ্যাক্‌কে খুজে পাওয়া যাচ্ছেনা হুজুর ! ভোরের বেলা ওই বনের ধারে 'জো'র ডাক শুনে, আমরা জো'কে ধরে এনে বেধেছি। কিন্তু চারিদিক

খুঁজে কোথাও জ্যাকের সাড়া পাচ্ছিনি। সাত-আট জনকে চারিদিকে পাঠিয়েছি তার খোঁজ করবার জন্য।”

সাহেব বিষম আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“কত রাতে তোরা জ্যাকের ডাক শেষ শুনেছিলি?”

সকলেই একসঙ্গে জবাব করিল—“প্রায় শেষ রাত পর্য্যন্ত দুটো কুকুরের ডাকই আমরা শুন্‌ছিলুম। তারপর একবার খুব জোরে বৃষ্টি এলো, তখন থেকে আর জানি না। ভোরের বেলা ওই বনের কাছে ‘জো’র চীৎকার শুনে, আমরা আশ্চর্য্য হয়ে, ছুটে গিয়ে দেখলুম—বনের দিকে চেয়ে—একলা “জো” বিষম জোরে-জোরে ডাক্‌ছে। সেইখান থেকে ওকে ধরে এনেছি, হুজুর!”

সাহেব বুঝিতে পারিলেন না ব্যাপারটা কি? জিজ্ঞাসা করিলেন—“জোকে সঙ্গে নিয়ে তোরা বনের ভিতরে খুঁজ্‌তে যাস্‌নি কেন?”

তাহারা আবার বলিল—“দু’জন শিকারী বনের ভিতরে খুঁজতে গেছে। হুজুরের ওঠবার সময় হ’লো ব’লে, আমরা জোকে নিয়ে আমাদের কাজ করতে ফিরে এসেছি।”

সাহেব তাহাদের বিদায় দিয়া মুখ-হাত ধুইতে চলিয়া গেলেন। কুকুরটার প্রবল চীৎকার থামিলেও, সে মাঝে মাঝে এক একবার থাকিয়া থাকিয়া কেবলই ডাকিয়া উঠিতে লাগিল।

ঘণ্টা দুই পরে, কাছের বস্তির জনকতক লোক আসিয়া বলিল—“কাল রাতের বৃষ্টিতে বাঘের ভারি উৎপাত গেছে হুজুর! দু’টো খোঁয়াড়ের ভিতর থেকে একটা ভেড়া আর

একটা ছাগল নিয়ে গেছে। তা' ছাড়া, শেষ রাত্রে নেক্‌ড়াতে একটা কুকুরকে পর্য্যন্ত আমাদের চোখের ওপোর থেকে নিয়ে গেছে।"

"আমারও "জ্যাক্" কুকুরটাকে পাওয়া যাচ্ছে না।"—বলিয়া সাহেব সকল কথা বলিলেন। তাহা শুনিয়া বস্তির লোকেরা বলিল—"এখানে নেক্‌ড়ারও উপদ্রব খুব আছে হুজুর! চিতাগুলো মাঝে মাঝে আসে বটে, কিন্তু নেক্‌ড়াগুলো রোজই আসে বস্তির ভিতরে। কুকুরের ওপোরেই তাদের নজর বেশী—বস্তির কুকুরগুলোকে প্রায় শেষ করে এনেছে। আপনার "জ্যাক্" কুকুরকেও নেক্‌ড়াতে নিয়ে গেছে নিশ্চয়।"

সাহেব বুঝিতে পারিলেন না নেক্‌ড়া কি? জিজ্ঞাসা করিলেন—"নেক্‌ড়াতে মানুষ মারে?"

তাহারা জবাব করিল—"মানুষ মার্‌তে কখনো শুনিনি হুজুর, তবে মানুষকে চোট করে, আর ছোট ছেলেপুলে নিয়ে যায়। কুকুরের ওপোরেই তাদের লোভ বেশী। দেখ্‌তে বাঘের মতো বটে, বড়ও চিতাগুলোর সমান, কিন্তু মুখ আর ল্যাজ অনেকটা শিয়ালের মতো, শিয়ালের মতোই স্বভাব; দল বেঁধে ঘোরে, ভারি শয়তান।"

সেই সময়ে বনের ভিতর হইতে একজন শিকারী ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"নেক্‌ড়াতে জ্যাক্‌কে নিয়ে গেছে হুজুর, তার চিহ্ন দেখেছি, কিন্তু নেকড়াগুলো পালিয়েছে মারতে পারিনি।"

সাহেব আর থাকিতে পারিলেন না। বস্তির জন দুই লোক

এবং সেই শিকারীকে সঙ্গে করিয়া বন্দুক লইয়া দুপরের আগেই বনের ভিতরে গিয়া ঢুকিলেন। 'জো' কুকুরও ছুটিল সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে।

[২]

বনের ভিতর নানা জায়গা ঘুরিয়া ঘুরিয়াও তাঁহারা কিন্তু নেকড়া কি চিতা, কি কোন রকম বুনো জানোয়ারের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলেন না, অথচ সাহেবের সঙ্গীরা সকলেই হয়রাণ হইয়া পড়িলেন। সেই সময় অল্পদূরে কতকগুলো খুব বড় বড় বালির ঢিবি দেখিয়া, শিকারী চুপি চুপি বলিল—

"ওইখানে হুজুর, নেকড়ার গর্ত্ত দেখেছি!"

সাহেব তখনি, সকলকে ভিন্ন ভিন্ন দিক দিয়া ঘুরিয়া সেই ঢিবিগুলোর কাছে যাইতে বলিয়া, নিজে খুব সাবধানে, নিঃশব্দে পা-টিপিয়া টিপিয়া সোজা আগাইয়া সেইদিকে চলিলেন।

বালির ঢিবিগুলোর নীচে খানিকদূর পর্য্যন্ত খুব লম্বা-লম্বা ঘাস হইয়া সাহেবের যাইবার পথ একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। সেই ঘাসের জঙ্গল দু'হাতে ঠেলিয়া পথ করিয়া সাহেব যেমন আগাইতে যাইবেন, অমনি তাঁহার কুকুরটা হঠাৎ সুমুখে থমকিয়া দাঁড়াইয়া মুখ তুলিয়া জোরে জোরে শুঁকিতে লাগিল। সঙ্গে-সঙ্গে চোখের পলকে প্রকাণ্ড এক চিতা ঠিক যেন তাঁর পায়ের গোড়া হইতেই বিষম লাফাইয়া তাঁহার মাথার উপর দিয়া বিদ্যুতের মতো দূরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সাহেবের বুক ধড়্-ফড়্ করিয়া উঠিল। মিনিট দুই থ হইয়া দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন সেই দিকে। কিন্তু চিতা যে কোথায় লুকাইল তা বুঝিতে পারিলেন না। সাহেব আবার আগাইয়া চলিলেন ঘাসবনের ভিতরে ঠিক্ তেমনি করিয়া।

একটু পরেই কুকুরটা হঠাৎ এমন ভাবে আগে গিয়া ঘাস-বনের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল যে, সাহেব বাধা দিতে পারিলেন না। কিন্তু পা কতক যাইবার পরে, সাহেব যেমন একটা বাঁক ঘুরিয়া বালিয়াড়ির দিকে আগাইতে যাইবেন, অমনি চকিতে সে নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিয়াই সাহেবের জুতায় কামড়াইয়া কি ইসারা করিল তা কেবল সাহেব নিজের মনেই বুঝিলেন। পরক্ষণেই তিনি বন্দুক তুলিয়া সেই দিকে ফিরিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘাসের ভিতরে দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই বিপরীত দিকের লম্বা ঘাসগুলো নড়িয়া কেমন এক ঈষৎ শব্দ উঠিল। সাহেবও তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া চাহিলেন সেই দিকে। কিন্তু ভালো করিয়া বুঝিতে না বুঝিতেই, সাহেবের মনে হইল, যেন আর একটা চিতা বিদ্যুতের মতো দেখা দিয়াই পলকের ভিতরে দূরে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহাদের আশ্চর্য্য লুকাইবার এবং পলাইবার শক্তি দেখিয়া সাহেব অবাক হইয়া গেলেন। হাতের বন্দুক তাঁহার হাতেই রহিল, অথচ তাঁহার সম্মুখ হইতে তাঁহারই চোখের উপর দুই দুইটা প্রকাণ্ড চিতা দেখা দিয়া ঠিক যেন তাঁহাকে রহস্য করিয়াই নির্ব্বিঘ্নে পলাইয়া কোথায় যে লুকাইয়া পড়িল তার আর ঠিকানা রহিল

না। সাহেব অবাক হইয়া একদৃষ্টে সেই দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন মূঢ়ের মতো।

একটু পরেই হঠাৎ তাঁহার নজর পড়িল—একটা বালির ঢিবির দিকে। আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন, তাঁহারই সঙ্গের একটা মানুষ, এক বালিয়াড়ির চূড়ায় দাঁড়াইয়া শীঘ্র সেইখানে যাইবার জন্য তাঁহাকে ইসারা করিতেছে। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া সাহেবের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, লোকটা সেইখানে কোথাও কোন একটা জানোয়ারের সন্ধান পাইয়াই, তাঁহাকে শীঘ্র যাইবার জন্য ডাকিতেছে। উৎসাহে মাতিয়া তাড়াতাড়ি ঘাসবন ছাড়াইয়া তিনি গিয়া উঠিলেন সেই বালিয়াড়ির উপর।

লোকটা তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া কহিল—"হুজুর ওপাশের ঢিবিটার পিছন দিকে মস্ত একটা গর্ত্তের ভিতরে নেক্ড়া ঘুমোচ্ছে। এখান থেকে দেখা যাবে না। শীগ্‌গির ওই ঢিবিটার ওপোরে উঠুন গিয়ে—পরিষ্কার দেখ্‌তে পাবেন।"

তাহার কথা মতো সাহেব, সেইদিকে গিয়া ঢিবির উপরে উঠিয়া দেখিলেন যে, বাস্তবিকই পাশের দিকের প্রকাণ্ড একটা বালিয়াড়ির মাঝামাঝি জায়গায়, গহ্বরের মতো একটা বড় গর্ত্তের ভিতরে বাঘের মতো ডোরা-কাটা কি একটা জানোয়ার ঘুমাইতেছে। সেখান হইতে বন্দুক চালাইবার সুবিধা না পাইয়া—তিনি সেখান হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে গিয়া, সাবধানে সেই বালিয়াড়ির গর্ত্তের মুখে উঠিতে লাগিলেন। কুকুরটা তাঁহার আদেশে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল বালিয়াড়ির নীচে কতকগুলো ঝোপের ধারে।

গর্ত্তের মুখের কাছে গিয়া সাহেব নীচের দিকে পা দিয়া লম্বাভাবে বালিয়াড়ির গায়ে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া বন্দুক তাগ করিতে গেলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁ'র পায়ের নীচ হইতে বালি খসিয়া গেল আর তিনি সড়্ সুড়্ শব্দ করিয়া নামিয়া পড়িলেন হাত দুই তিন নীচে।

সেই শব্দে জানোয়ারটাও জাগিয়া বাহির হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল ঠিক তাঁহার মাথার ওপরেই—গর্ত্তটার মুখে। সেই ভাবে থাকিয়াই সাহেবও অমনি গুলি করিলেন—গুড়ুম্! নীচ হইতে কুকুরটাও আহ্লাদে ডাকিয়া উঠিল—ঘেউ ঘেউ!

পরক্ষণেই জানোয়ারটা ছট্‌ফট্ করিতে করিতে হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল একেবারে সাহেবের ঘাড়ের উপর। সাহেব তেমন অবস্থায় পড়িয়া টাল সামলাইতে পারিলেন না, জানোয়ারটা সহ হুড়মুড় করিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিলেন নীচের দিকে।

এদিকে, বন্দুকের আওয়াজে ভয় পাইয়া নীচের একটা ঝোপের ভিতর হইতে ঠিক তেমনি চেহারার তিন-চারিটা সেই রকমের জানোয়ার বাহির হইয়াই ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল কে জানে কোন দিকে এবং তাহাদেরই একটা কুকুরটাকে সামনে পাইয়া এমন ভাবে চকিতে তার ঘাড় কাম্‌ড়াইয়া লইয়া পলাইল যে, একবারমাত্র সামান্য একটু শব্দ করা ছাড়া কুকুরটা আর চেঁচাইবারও সময় পাইল না। পরক্ষণেই জানোয়ারের সঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া গড়াইতে গড়াইতে সাহেবও ধপ্ করিয়া পড়িয়া গেলেন সেই ঝোপটার কাছেই কতকগুলো পাথরের উপর।

কষ্টে গা ঝাড়িয়া উঠিয়া সাহেব দেখিলেন যে, জানোয়ারটা মরিয়া গেলেও তার নখ লাগিয়া পোষাকের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গায়ের চার পাঁচ জায়গা অল্প অল্প ছিঁড়িয়া গিয়াছে। কাছেই একটা জায়গায় নালার মতো ঝির-ঝির করিয়া জল বহিয়া যাইতেছিল। সাহেব তাড়াতাড়ি গিয়া গায়ের ক্ষতগুলি সে জলে ধুইয়া রুমাল ভিজাইয়া জড়াইতে লাগিলেন সেই সব যায়গাতে।

বন্দুকের শব্দ পাইয়া অল্পক্ষণের ভিতরেই একমাত্র সেই শিকারী ছাড়া আর আর সকলে সেইখানে আসিয়া জমা হইল। মরা জানোয়ারটাকে দেখিয়াই তা'রা আহ্লাদে চেঁচাইয়া উঠিল—"উঃ—মস্ত বড় নেক্ড়া দেখছি যে!"

সাহেব সেইখান হইতেই বলিয়া উঠিলেন—"এই তোমাদের নেক্ড়া? আমি ভেবেছিলুম আর কিছু হবে। একে আমরা বলি 'হায়েনা'। এও ভয়ানক বটে, কিন্তু বাঘের মতো নয়।"

তারপর সাহেব উঠিয়া আসিয়া তাঁহার কুকুরকে ডাকিতে লাগিলেন—'জো'—'জো'!

কিন্তু 'জো'র সন্ধান কোথাও মিলিল না। অল্পক্ষণ পরেই মরা 'জো'কে টানিয়া আনিয়া সেই শিকারী আসিয়া বলিল—"বন্দুকের আওয়াজ শুনে এই দিকে ছুটে আসছিলুম। ওই বালির ঢিবিটার ওপোরে উঠ্‌তেই চোখে পোড়লো—একটা নেকড়া কুকুরটাকে মুখে নিয়ে পলাচ্ছে। তখনি তীর মারলুম, তীরটা কিন্তু গায়ে না লেগে তার একটা কান কেটে দিয়ে চলে গেলো।

নেকড়াটাও ভয়ে কুকুরটাকে ফেলে পলালো। আর তার সন্ধান করতে পারলুম না, কুকুরটাকে তুলে নিয়ে এলুম।"

প্রায় এক সঙ্গেই দুইটা কুকুর হারাইয়া সাহেবের বড় দুঃখ হইল। কিন্তু উপায় কি ? সাহেবের হুকুমে মরা হায়েনার সঙ্গে কুকুরটাকেও তুলিয়া লইয়া তাঁহার লোকজনেরা বাংলায় আসিল। সাহেব 'জো'কে কবর দিয়া চোখের জল ফেলিলেন।

[৩]

বস্তির লোকদিগের দেখাদেখি সাহেবও তাঁহার আরদালিকে দিয়া বাঙ্গলার পিছন দিকে একটা খোঁয়াড় করিয়া ভেড়া, ছাগল, শূকর ও মুরগী পুষিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কুকুর দুইটা মরিবার পর, রাত্রে খোঁয়াড় চৌকী দেওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। তখন তিনি বড় বড় শাল এবং অন্য নানা রকমের কাঠ আনাইয়া খোঁয়াড়টাকে খুব ভাল করিয়া ঘিরিলেন। তবুও কিন্তু তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না।

দিনকতক পর হঠাৎ এক গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলে সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া শুনিলেন যে, খোঁয়াড়ের ভিতরে তাঁহার পালিত পশুগুলি ভয় পাইয়া ছট্‌ফট্ করিতে করিতে ডাকাডাকি স্থরু ক'রে দেছে। তিনি তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়া বন্দুক লইয়া বাহির হইলেন। কিন্তু কোথাও কিছু দেখিতে পাইলেন না।

পরের দিন সকালে উঠিয়া খোঁয়াড়ের বেড়া ভালো করিয়া পরীক্ষা করিতেই তাঁহার মনে হইল—কেউ যেন টানাটানি

করিয়া খোঁয়াড়ের দরজার ঝাঁপখানাকে অনেকখানি আল্‌গা করিয়া ফেলিয়াছে। তা' ছাড়া দু'চার জায়গায় বাঁধন ছেঁড়া এবং আঁচড়-কামড়ের দাগও যে দেখিতে না পাইলেন এমনও নয়। তখনি সেগুলি মেরামত করাইয়া দিলেন।

তিন চার দিন পর আবার এক রাত্রে তেমনি ঘটিল। সেই রকম চার পাঁচবার ঘটিবার পর সাহেব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। এক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুর পরামর্শ লইয়া একটা নূতন রকমের কৌশল খাটাইয়া রাখিলেন।

তিনি তাঁহার পিছনের বারাণ্ডায় একটা গুলি ভরা 'রাইফেল' বন্দুক শক্ত করিয়া বসাইয়া বন্দুকের নলের মুখে বড় একটা খাসির পিছনের রাং ঝুলাইয়া রাখিলেন। তারপর বন্দুকের ঘোড়াটা তুলিয়া সরু তার দিয়া এমন ভাবে সেই রাংটার সঙ্গে যোগ করিয়া রাখিলেন যে, রাংখানাকে কেউ টানিলেই, তখনি আপনা হইতে বন্দুকের ঘোড়া পড়িয়া গুলি ছুটিয়া গিয়া তাহার গায়ে লাগিবে।

চার পাঁচ দিন কিন্তু কিছুই ঘটিল না। সাহেবও প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় টাট্‌কা রাং আনাইয়া সেই ভাবে ঝুলাইয়া বন্দুকের সঙ্গে যোগ করিয়া রাখিতে লাগিলেন।

শেষে একদিন গভীর রাত্রে আবার তেমনি খোঁয়াড়ের পশুগুলির চীৎকারে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পিছনের বারাণ্ডার দিকের জানালায় কান পাতিয়া রহিলেন।

মিনিট পাঁচ সাত পর, তাঁহার সেই বারাণ্ডায় কাহার যেন

পায়ের খুব নরম আওয়াজ হইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দু' একটা জোর নিশ্বাসের শব্দও যে না শুনিলেন এমন নয়। কিন্তু তারপরই তাঁর 'রাইফেল' বন্দুক আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া বিষম জোরে হঠাৎ গর্জ্জিয়া উঠিল—গুড়ুম!

সঙ্গে সঙ্গে বারাণ্ডার উপরে কাহার যেন দাপাদাপি হইতে লাগিল মিনিট চার পাঁচ ধরিয়া। তারপরেই ধুপ্ করিয়া একটা নরম আওয়াজ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সব ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া সাহেব তাড়াতাড়ি সেই বারাণ্ডায় গিয়া আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুর কৌশল কাজে লে'গে' গেছে। প্রায় চার হাত লম্বা প্রকাণ্ড একটা চিতা বাঘ মরিয়া লম্বা হইয়া পড়িয়া আছে বারাণ্ডার উপর।

বাঘটার চেহারা অতি সুন্দর! সর্ব্বাঙ্গে ফিঁকে হোল্‌দে রংএর উপরে কালো রংএর গোল গোল ছাপ। তার উপর যেমন পিছল তেমনি চক্‌চকে! ঠিক মুখের ভিতর দিয়া গুলি ঢুকিয়া মাথার পিছন দিয়া বাহির হ'য়ে গেছে। তা' ছাড়া, শরীরের আর কোথাও সামান্য আঁচড়ের দাগটুকু অবধি নাই।

কথাটা চারিদিকে রটিয়া যাইতে দেরী হইল না। দলে দলে লোক আসিয়া বাঘটাকে দেখিয়া তার সুন্দর চেহারার ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। সাহেব তাঁর ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুকে সেই বাঘের চামড়াখানা উপহার দিয়া উভয়ের বন্ধুত্ব আরও পাকা করিয়া লইলেন।

সেই দিনকার রাতটা বেশ স্বচ্ছন্দে কাটিল বটে, কিন্তু তার পরের রাত্রি হইতে আরম্ভ হইল আর এক ভয়ানক ব্যাপার। সন্ধ্যার পর হইতেই মরা বাঘের জোড়াটা আসিয়া বাংলার চারিদিকে তার সঙ্গীকে খুঁজিতে লাগিল এবং তা'কে না পাইয়া এমন ভয়ানক হইয়া উঠিল যে, বাংলার চাকর-বাকরদের কাজকর্ম্ম তো দূরের কথা, ঘর হইতে বাহির হওয়াই হইয়া উঠিল মুস্কিল।

বাঘের সাড়া পাইবামাত্রই সাহেব বন্দুক লইয়া বাহির হইতে লাগিলেন কিন্তু বাঘটাও এমন বিদ্যুতের মতো চলা-ফেরা সুরু করিয়া দিল যে, তিনি কিছুতেই তাহাকে তাগ করিতে পারিলেন না। শেষে এমন হইল যে, বাঘের ভয়ে সাহেবের সমস্ত লোকজন চাকরিতে জবাব দিয়া চলিয়া যাইতে চাহিল। তখন সাহেব আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিন দিনের ভিতর বাঘটাকে মারিয়া অথবা সেখান হইতে তাড়াইয়া দিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি লোকজনদিগকে থামাইয়া রাখিলেন।

সাহেব আবার সেই বন্দুকের ফাঁদ পাতিলেন, কিন্তু বাঘ সে দিক দিয়াও গেল না। দ্বিতীয় রাত্রে সে গিয়া পড়িল তাঁহার পশুগুলির খোঁয়াড়ের উপর এবং এমন ভাবে খোঁয়াড়টাকে ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিল যে, পশুগুলি বিষম ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে আকাশ-ফাটা চীৎকার জুড়িয়া দিল।

সাহেব তাড়াতাড়ি বন্দুক লইয়া বাহির হইয়াই আওয়াজ করিলেন—গুড়ুম! সঙ্গে সঙ্গে বাঘও সরিয়া গেল, পশুগুলিও ঠাণ্ডা হইয়া চুপ করিল। সাহেবও ঘরে ফিরিয়া আসিয়া শুইয়া পড়িলেন।

কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরেই আবার বাঘ আসিয়া তেমনি উপদ্রব আরম্ভ করিল। সাহেব আবার বন্দুক লইয়া বাহির হইয়া ফাঁকা আওয়াজ করিলেন। বাঘও তখনকার মতো আবার থামিল।

আবার ঘণ্টাখানেক পরে আরম্ভ হইল সেই ব্যাপার। এবার সাহেব বিছানা হইতে উঠিয়া বন্দুক ছুড়িয়া বাঘের উপদ্রব থামাইলেন। এমনি করিয়া সেদিন সারারাত্রি ধরিয়া চিতা তাঁহাকে পাগল করিয়া ছাড়িল।

পরদিন রাত্রে আবার খোঁয়াড়ের পশুগুলির চীৎকার স্বরু হইলে সাহেব আর থাকিতে না পারিয়া আস্তে আস্তে বন্দুক লইয়া ঘরের বাহির হইলেন এবং খুব আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া আগাইয়া চলিলেন সামনের দিকে।

রাত্রি তখন আন্দাজ দুইটা। মেঘ-ঢাকা চাঁদের আব্‌ছা আলোকে চারিদিকই—আলো-ছায়ায় মেশামিশি করিয়া—ঠিক যেন অস্পষ্ট স্বপ্নলোকের মতো দেখাইতেছিল। স্পষ্ট করিয়া কিছুই বুঝিবার উপায় ছিল না। সেই আলো-অন্ধকারের ভিতর দিয়া সাহেব এখন নিঃশব্দে আগাইয়া চলিলেন খোঁয়াড়ের দিকে।

সাম্‌নের দিকে অল্প দূরেই পাথরের ঢিবির মতো কি একটা হঠাৎ সাহেবের নজরে পড়িল। কিন্তু নানারকমের ছোট বড় অনেক পাথরই তাঁহার বাংলার চারিদিকে ছড়ানো ছিল বলিয়া ঢিবিটাকে পাথর ভাবিয়াই তিনি সেইভাবে আগাইয়া চলিলেন।

কিন্তু কাছে গিয়া পড়িবামাত্রই ঢিবিটা হঠাৎ যেন নড়িয়া

উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিষম ধারালো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নখওয়ালা মস্ত দু'টো থাবা তাঁহার দুই কাঁধ চাপিয়া ধরিল। বিষম চম্‌কাইয়া সাহেব চাহিয়া দেখিয়াই মুহূর্ত্তের জন্য জ্ঞান হারাইলেন। পরক্ষণেই কিন্তু তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধি ফিরিয়া আসিল, প্রাণপণ শক্তিতে দুই হাতে বাঘের দুই চোয়াল চাপিয়া ধরিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন তার চোখের দিকে।

সাহেবের দুই কাঁধে সজোরে দুই থাবা বসাইয়া বাঘটা পিছনের দু'পায়ে দাঁড়াইয়া সমস্ত শরীরের শক্তি দিয়া তাঁহাকে ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সাহেব কিন্তু না পড়িয়া হাঁটুগাড়িয়া দু'হাতে তাকে ঠেলিয়া রাখিলেন। দু'জনেরই চোখ রহিল দু'জনের চোখের উপর স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া। কাহারও চোখে একটি মাত্রও পলক পড়িতে পাইল না। গভীর নিশীথে দু'জনে দু'জনকে মরণের গ্রাসের ভিতর রাখিয়া পাথরের মূর্ত্তির মতো স্তব্ধ হইয়া রহিল।

দু'মিনিট পাঁচমিনিট করিয়া আধঘণ্টারও বেশী কাটিয়া গেল। কিন্তু দু'জনের কেউ কাহাকেও ছাড়িল না বা নাড়িল না কি চোখের পলক পর্য্যন্ত ফেলিতে সাহস করিল না।

সাহেবের বন্দুক পায়ের কাছেই পড়িয়া গিয়াছিল। বাঘের নখ ক্রমেই তাঁহার কাঁধের ভিতর বসিয়া অসহ্য যাতনা দিতেছিল। তাঁহার একটু মাত্র নড়িবার উপায় ছিল না। সাহেব বুঝিলেন, এরূপ ভাবে আর বেশীক্ষণ থাকিলে তাঁহাকেই

আগে শুইয়া পড়িতে হইবে। তিনি জীবনের আশা বিসর্জ্জন দিয়া মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকিয়া মরণ-কালের প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ তাঁহার মাথায় এক মতলব জোগাইল। পূর্ব্বের মত স্থির দৃষ্টিতে বাঘের চোখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বাঁ হাত দিয়া বাঘের চোয়ালটা খুব জোরে ঠেলিয়া রাখিয়া আস্তে আস্তে ডান হাতখানাকে এমন সন্তর্পণে সরাইয়া লইলেন যে, বাঘ তা' মোটেই জানিতে পারিল না।

তারপর তেমনি ভাবে ডান হাত দিয়া বন্দুকটা টানিয়া লইয়া ঠিক তেমনি ভাবেই বন্দুকের নলটা ধীরে ধীরে তুলিয়া নিজের ডান হাঁটুর উপর রাখিলেন, এবং তারপর তেমনি সন্তর্পণে ঘোড়া টানিয়া দিয়া চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতেই বাঁ হাতখানা সরাইয়া লইয়া পিছনে হেলিয়া পড়িলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক বেগে গুলি ছুটিয়া বাঘের গলা ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া গেল। বাঘটাও সঙ্গে সঙ্গে ধপ্ করিয়া পড়িয়া গেল প্রায় তাঁহার গায়ের উপর। সাহেব অতিকষ্টে গড়াইয়া ফুটখানেক সরিয়া গেলেন।

তারপর তিনি যখন ঘরে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার শরীরে তিলমাত্র শক্তি ছিল না। তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে খবর পাঠাইয়া দিয়া তিনি সেই বারাণ্ডাতেই শুইয়া পড়িলেন।

সেই খবর পাইয়া ষ্টেশনের সকল লোক ছুটিয়া আসিল এবং তখনি টেলিগ্রাম করিয়া পৃথক গাড়ী আনাইয়া সাহেবকে পাঠাইয়া দিল সদরের হাঁসপাতালে।

প্রায় সাতমাস হাঁসপাতালে থাকিবার পর সাহেব সুস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু বাঘের নখের চিহ্ন চিরদিনের মতো তাঁহার দেহে রহিয়া গেল।

বিপদের মুখে

[১]

গয়া সহরের কিছু দূরে ছোট একখানি গ্রাম। গ্রামে আহীর গোয়ালা আর চাষাভূষো লোকের বসতিই বেশী। সম্পত্তির মধ্যে তাহাদের প্রায় সকলেরই বিঘাকতক করিয়া চাষের জমী, আর এক পাল করিয়া মহিষ।

গ্রামের অল্প দূর হইতেই বন আরম্ভ। গ্রামের কাছাকাছি সেই বন পাতলা হইলেও, কিয়দ্দূর হইতে ক্রমে নিবিড় হইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। বনে বাঘ ভালুকের ভয়ও যথেষ্ট। তবুও গ্রামের লোকেরা সকাল বেলায় দুধ দুহিয়া লইয়া আপন আপন মহিষের পালগুলিকে সেই বনের দিকেই খেদাইয়া দেয়। সারাদিন ধরিয়া তারা বনের মধ্যে ইচ্ছা মতো নানা জায়গায় ঘুরিয়া ফিরিয়া ঘাস খায়।

বেলা পড়িয়া আসিলে কোন কোন গৃহস্থের বাড়ী হইতে লোক গিয়া তাহাদের পালের মহিষগুলিকে খুঁজিয়া ঘরে ফিরাইয়া আনে। এই রকম একটা পালকে ঘরে ফিরিতে দেখিলে অন্য অন্য পালগুলিও তার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া নিজ নিজ ঘরে চলিয়া যায়।

অনেক সময়েই কিন্তু দু'একটা মহিষের পাল ঘরে না ফিরিয়া বনের ভিতরেই রাত্রি কাটাইয়া দেয়। সে পালে

দুধেলা মহিষ না থাকিলে গৃহস্থেরা তৎপ্রতি বড় বেশী মন দেয় না। কিন্তু থাকিলে সেগুলিকে খুঁজিয়া ঘরে আনিতে হয়। আবার অনেক সময় কোন কোন মহিষ পাল হইতে সরিয়া পড়িয়া গভীর বনে ঢুকিয়া—সঙ্গীহারা হইয়া—একেলা ঘুরিয়া বেড়ায়। তখন কিন্তু তা'কেও খুঁজিয়া বাহির করিয়া আনিবার আবশ্যকতা হয়।

সেইজন্য গৃহস্থ সকলেই তাহাদের আপন আপন পালের সমস্ত মহিষগুলির গলায়—কা'রও একটা—ক'ারও বা দুইটা তিনটা করিয়া ছোট ছোট ঘণ্টা বাঁধিয়া দেয়। সঙ্গীহারা মহিষ—যে দিকে—যতদূরই থাকুক না কেন, ঘণ্টার শব্দ শুনিলে সহজেই তাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারা যায়।

মহিষের পালগুলি একসঙ্গে থাকিলে গভীর বনেও তা'দের কিছুমাত্র ভয়ের কারণ থাকে না বটে, কিন্তু পাল হইতে বাহিরে একেলা সরিয়া পড়িলেই তার বিপদ ঘটে। বাঘও যেন ঠিক সেই সুযোগের জন্য ওৎ পাতিয়া থাকে।

এই সব পোষা মহিষের পালগুলি ছাগল ভেড়ার মতো ঠাণ্ডা বটে, কিন্তু কোন বিপদের আশঙ্কা কিম্বা রাগের কারণ ঘটিলে হঠাৎ তা'দের বুনো স্বভাব যেন আপনা হইতেই জাগিয়া উঠিয়া সে গুলিকে একেবারে যমের দোসর করিয়া তোলে। তখন তাদের সুমুখ হইতে প্রাণ লইয়া পলানো—মানুষ তো দূরের কথা—বোধ করি বাঘ-ভালুকের পক্ষেও কঠিন হইয়া ওঠে।

[২]

বিশেষ কাজে পড়িয়া সাহেবের সঙ্গে যখন সেই বনের ধারে মাঠের পথ দিয়া গিয়া পৌঁছিলাম, তখন শেষ ভাদ্রের দু'পরের সূর্য্য মাথার উপরে যেন আগুন ঢালিয়া দিতেছিল।

সাহেব ছিলেন মিলিটারী। অনেক কাল ফৌজের সঙ্গে কাটাইয়া পেন্‌সন্ লইয়া নিজের কারবারে লাগিয়াছিলেন। প্রখর রৌদ্রে, দুরন্ত বর্ষায় নানা যায়গায় ঘুরিয়া ভারতের আব্-হাওয়া তাঁহার এমন সহিয়া গিয়াছিল যে, এদেশের প্রকৃতির কোন উপদ্রবই তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। তবুও ভাদ্রের সেই পোড়া রোদে ক্রমাগত দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া সে দিন তাঁহাকে বেজায় কাবু হইতে হইয়াছিল। একটু জল পাইবার আশায় কোন একটা গ্রামে পৌঁছিবার জন্য তিনি অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন।

আমরা যেখানে গিয়া পৌঁছিয়াছিলাম, সেখান হইতে গ্রাম বেশী দূর নয়। এক দিকে খানিকটা দূরেই উঁচু-নীচু পাহাড়ে জায়গা—তার পরেই বন আরম্ভ। অন্য দিকে মাঠ ও চাষের জমী—মাঝে মাঝে দুই চারিটা বড় বড় গাছের পাতার ভিতরে বসিয়া পাখীর ঝাঁক রৌদ্রের তেজে নিঃশব্দে ঝিমাইতেছে। মাঝখানে রাস্তার উপরে আমরা দু'টিমাত্র মানুষ—জল ও বিশ্রামের আশায় তাড়াতাড়ি গ্রামের দিকে চলিয়াছি।

এ অঞ্চলে আসিয়া অবধি রোজই পথে-ঘাটে-প্রান্তরে পালে পালে বিস্তর মহিষ চরিতে দেখিয়াছি, কাজেই আমাদের

সম্মুখে ডাইন দিকে বনের ধারে এক দল মহিষকে চরিতে দেখিয়া আমরা তা' গ্রাহ্যই করি নাই।

কিন্তু খানিকদূর তেমনি যাইবার পর আমরা যখন সেই মহিষের পালের কাছাকাছি গিয়া পড়িলাম, তখন হঠাৎ সেই দিকে নজর পড়াতে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম যে, পালের তিন চারিটা বড় বড় মহিষ চরা বন্ধ করিয়া রক্ত চক্ষে ও একদৃষ্টিতে আমাদিগকে কট্‌মট্‌ করিয়া দেখিতেছে।

তা'দের চোখের সেই জ্বলন্ত চাহনী দেখিয়া ভয়ে আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। অল্প দূরেই গ্রাম দেখা যাইতেছিল। আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম—"সাহেব, একটু শীগ্‌গির শীগ্‌গির পা চালিয়ে চল, মোষগুলোর চাউনি ভাল ঠেক্‌ছে না।"

সাহেব একবারমাত্র সেই দিকে তাকাইয়া অগ্রাহ্য ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"ছ্যাঁ ছ্যাঁ, এত ডর ? কি করবে মহিষে ? তার চেয়ে ধূপের ডর বেশী, আমার ছাতা দাও।"

আমি আর জবাব না করিয়া সাহেবের ছাতাটি তাঁহার হাতে দিলাম। সাহেবও তাহা খুলিয়া মাথায় দিলেন। আর যায় কোথায় ?

ছাতা মাথায় দিয়া দুই চারি পা আগাইয়া যাইতে না যাইতেই, হঠাৎ পিছন দিকে বিষম ভোঁস্‌ ভোঁস্‌ শব্দ উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে জোর ঘণ্টাধ্বনি ও ঘন ঘন খুরের শব্দে গাছের উপরের আধ্‌ ঘুমন্ত পাখীর ঝাঁক হঠাৎ সজাগ হইয়া বেজায় চীৎকারে আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া চারিদিকে উড়িয়া পলাইতে লাগিল।

মুহূর্ত্তের ভিতরেই নিস্তব্ধ দু'পরের সেই নীরব পল্লী-প্রকৃতি তোলপাড় করিয়া যেন একটা জীবন্ত বিভীষিকা তাহার তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দিল।

[৩]

চকিতে চম্‌কাইয়া সেই দিকে চাহিতেই মনে হইল যেন একটা প্রলয়ের তুফান সেই অঞ্চলটা একেবারে অন্ধকার করিয়া বেজায় দাপটে আমাদের দু'টী প্রাণীকে গিলিতে আসিতেছে!

হঠাৎ বিপদে অনেক সময়েই মানুষকে প্রায় অজ্ঞান করিয়া ফেলে। আমারও সেই দশা ঘটিল। আচম্‌কা কি যে ঘটিল বুঝিতে না পারিয়া—কি যে করিব—স্থির করিতে পারিলাম না। হতভম্বের মতো দাঁড়াইয়া সেই দিক্ পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলাম। প্রতি মুহূর্ত্তেই সেই তুফানের অন্ধকার আমার কাছে—কাছে—আরও কাছে ঘনাইয়া আসিয়া পড়িতে লাগিল।

কতক্ষণ যে সে ভাবে কাটিল বলিতে পারি না। হঠাৎ আমার জ্ঞান ফিরিল—বিষম তর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সাহেব আমাকে এক সজোর ধাক্কা দিয়া ধম্‌কাইয়া বলিয়া উঠিলেন—

"আর দেখ কি? মূর্খ! ঈশ্বরের দোহাই—ছোট—ছোট—প্রাণপণে ছুটে পলাও গ্রামের ভিতরে, নইলে আর রক্ষা নেই। মহিষগুলো যে রকম ক্ষে'পে তেড়ে আসছে, মুহূর্ত্তের ভিতরেই ওই ধূলোরাশির মতো আমাদিগকে গুঁড়িয়ে ধূলো করে দেবে।" —বলিয়াই যুদ্ধব্যবসায়ী সাহেব ঠিক যেন ঝড়ের মতোই বেগে ছুটিয়া চলিলেন গ্রামের দিকে। আমি তাঁর পিছনে পিছনে, ঊর্দ্ধশ্বাসে

প্রাণপণ ছুটিয়াও তাঁর নাগাল তো ধরিতে পারিলামই না বরং পড়িয়া রহিলাম অনেকখানি তফাতে। পিছনে শব্দ শুনিয়া বুঝিতে বাকী রহিল না যে, মহিষগুলি আমার খুবই কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। আর দু'চার মিনিটের ভিতরেই আমার চিহ্ন পর্য্যন্ত পৃথিবীর বুক হইতে লোপ করিয়া দিবে।

এদিকে ছুটিবার শক্তিও আমার ক্রমেই কমিয়া আসিতে লাগিল, দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। বুঝিলাম যে, সাহেবের যাহাই হোক, এ যাত্রা আমার আর রক্ষা নেই। হয় মহিষের শিঙ্গে, নয় নিদারুণ গরমে কি সর্দ্দিগর্ম্মীতে এখনি আমার সব শেষ হইবে।

মুহূর্ত্তের জন্য তেমনি ছুটিতে ছুটিতেই একবার প্রাণ ভরিয়া ঈশ্বরের নাম লইলাম। সারা জীবনের ভিতর বোধ করি আর কখনও তেমন ভাবে ডাকিতে পারি নাই। ক্ষণিকের জন্য একবার সুমুখের দিকে মুখ তুলিয়া দেখিলাম—দেখিলাম—সাহেব তেমনি ছুটিতে ছুটিতে—কে জানে কেন—হঠাৎ পলকের জন্য একবার থম্‌কাইয়া দাঁড়াইলেন, তারপরই পাশের একটা বড় গাছের কাছে ছুটিয়া গিয়াই—কাঠ বিড়ালের মতো—সড়্ সড়্ করিয়া উঠিয়া গেলেন তার উপর।

আমারও সাম্‌নে তেমনি একটা বড় গাছ ছিল। সাহেবের অবস্থা দেখিয়া আমার মাথায় বুদ্ধি যোগাইল—আমিও ছুটিয়া গিয়া উঠিয়া পড়িলাম সেই গাছটার উপর। তখন আর সাহেবের গাছে উঠিবার কারণ বুঝিতে আমার দেরী হইল না।

গাছের উপর হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম—গাঁয়ের কাছাকাছি কোন জায়গা হইতে আর এক পাল তেমনি মহিষ— তেমনি ভাবে তাড়া করিয়া সাহেবের সুমুখ দিক্ হইতে ছুটিয়া আসিতেছে।

দেখিতে দেখিতে সেই মহিষের পাল সাহেবের গাছের তলায় আসিয়া জমা হইল। তা'দের কতকগুলি উপরের দিকে চাহিয়া বেজায় রাগে ভোঁস্ ভোঁস্ করিতে করিতে খুর দিয়া জোরে জোরে মাটী খুঁড়িতে সুরু করিয়া দিল, আর বাকী মহিষগুলি ভীষণ গর্জ্জনে দিক্ কাঁপাইয়া স্থানটাকে যেন চযিয়া ফেলিতে লাগিল।

পরক্ষণেই তেমনি আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে আমার গাছটাও হঠাৎ বিষম জোরে দুলিতে আরম্ভ করিল। প্রাণপণে একটা ডাল জড়াইয়া ধরিয়া নীচের দিকে চাহিয়া যা' দেখিলাম তা'তে আমার ধড় হইতে প্রাণ যেন উড়িয়া পলাইল।

যে মহিষের পাল পিছন হইতে তাড়া করিয়াছিল, তা'রা সকলেই আসিয়া গাছটাকে একেবারে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। কতকগুলি আমার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া বিষম রাগে কেবলই ভোঁস্ ভোঁস্ করিতে করিতে খুর দিয়া মাটী খুঁড়িতেছে, আর বাকী মহিষগুলি শিং দিয়া জোরে জোরে ক্রমাগত ধাক্কা মারিয়া গাছটাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে।

প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হইতে লাগিল, এইবারই বুঝি গাছটা আমাকে লইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল!

[৪]

ঠিক সেই সময় গ্রাম হইতে জনকতক লোক বাহির হইয়া আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতে আসিতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—

"সঙ্গে লাল কাপড় কি লাল কোন জিনিস থাক্‌লে শীগ্‌গির ফেলে দাও—বড় ছাতা থাক্‌লে শীগ্‌গির ফেল, নইলে ক্ষেপা ভইসের দল ঠাণ্ডা হবে না।"

এতক্ষণ পর মহিষগুলির রাগের কারণ বুঝিতে আমাদের কা'রও বাকী রহিল না। আমার লাল পাগড়ী আর সাহেবের টুক্‌টুকে রাঙ্গা কোট্ দেখিয়া মহিষের পাল বিষম রাগে চোখ কট্‌মট্ করিয়া আমাদের দিকে চাহিয়াছিল। তার উপর সাহেবকে ছাতা খুলিয়া মাথায় দিতে দেখিয়া আর রাগ বরদাস্ত করিতে পারে নাই, আমাদিগকে মারিয়া ফেলিবার জন্য তাড়া করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে।

গাঁয়ের লোকদের কথা শুনিয়া তখনি আমি আমার মাথার লাল পাগড়ীটা খুলিয়া যতদূর সাধ্য তফাতে ছুড়িয়া ফেলিলাম। অমনি এক আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিল।

আমাকে যে মহিষগুলি ঘিরিয়াছিল তা'দের প্রায় সকলেই বিষম গর্জ্জন করিয়া একসঙ্গে লাফাইয়া সেই পাগড়ীটার উপরে গিয়া পড়িল—আর দেখিতে দেখিতে—মুহূর্ত্ত মধ্যেই পাগড়ীটা টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যে কোথায় উড়িয়া গেল, তার আর চিহ্ন মাত্র

রহিল না। সঙ্গে সঙ্গে সেই মহিষগুলির চেহারাও যেন ভোজ-বাজীর মতো বদ্‌লাইয়া দিব্য ঠাণ্ডা ও শান্তশিষ্ট হইল।

কিন্তু, দু'টো মহিষ কিছুতেই গাছের তলা ছাড়িল না, তা'রা তখনো আমার দিকে চাহিয়া রাগে ভোঁস্ ভোঁস্ করিতে লাগিল। তখন আমার নজর পড়িল গাছের একটা নীচু ডালের দিকে।

তাড়াতাড়ি গাছে উঠিবার সময় আমার ছাতাটা খসিয়া গিয়া আধ খোলা হইয়া গাছের ডালে ঝুলিতেছিল। তাড়াতাড়ি সেটাকে পা দিয়া নীচে ফেলিয়া দিলাম। মহিষ দু'টোও অমনি চোখের পলকে গিয়া ছাতাটার উপরে পাড়িয়া তার চিহ্ন পর্য্যন্ত ধূলোয় মিশাইয়া দিয়া ঠাণ্ডা হইল।

চোখের উপর সেই ব্যাপার দেখিয়াও সাহেব কিন্তু গায়ের কোটটা খুলিয়া ফেলিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। মহিষগুলিও না-ছোড়-বান্দা হইয়া ক্রমেই এমন জোরে জোরে গাছটাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল যে, আর অল্প পরে কি ঘটিত বলা কঠিন। গাঁয়ের লোকগুলি ততক্ষণ আরও কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল। তা'রা আবার চেঁচাইয়া বলিল—"সাহেব, তোমার লাল কোর্ত্তাটা খু'লে ফে'লে দাও, নইলে ও ভইসের পালকে আমরাও ঠাণ্ডা ক'রতে পারবো না। জল্‌দি খোল—জল্‌দি!"

সাহেব আর কি করেন? নেহাত দায়ে পড়িয়া একান্ত অনিচ্ছাতেই কোট্‌টা খুলিয়া ছুড়িয়া ফেলিলেন। মহিষের পালও তখনি সেখানে ছুটিয়া গিয়া সেটাকে শেষ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

আমরা কিন্তু কেহই তখন পর্য্যন্ত গাছ হইতে নীচে নামিতে সাহস করিলাম না। অল্পক্ষণের মধ্যেই গাঁয়ের লোকগুলি সেখানে আসিয়া পড়িল। তা'দের মধ্যে একজন আধ বুড়ো লোকের আদেশে দু'টি মাত্র ছোট ছেলে এক একটা ছোট গাছের ডাল হাতে লইয়া মহিষের পাল দু'টোকে অনায়াসে সেখান হইতে খেদাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। আমরাও আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া গাছ হইতে নামিয়া পড়িলাম।

আমাদের দরকার এবং পরিচয় শুনিয়া সেই আধ বুড়ো লোকটি পরম সমাদরে আমাদের দু'জনকেই সঙ্গে করিয়া তার বাড়ীতে লইয়া গেল। সেখানে এক একটা দড়ির চারপাই খাটিয়া পাইয়া, তা'তে গা ঢালিয়া, আমরা যে আরাম পাইলাম তেমন বোধ করি দু'জনের কেহই সারা জীবনের ভিতর আর কখনো পাই নাই।

সেই গ্রামের—সেই গৃহস্থের অনুরোধে তারই বাড়ীতে আমরা এক সপ্তাহ কাটাইলাম। বলা বাহুল্য যে, আমাদের খাওয়া-দাওয়া কি আদর-যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি হইল না। কিন্তু সরকারী সম্মানের চিহ্ন—ব্যাজ্ শুদ্ধ সাহেবের লাল বনাতের কোর্টটি যাওয়াতে তাঁ'র মনে যে দুঃখ হইল, তা' বোধ করি মরণের দিন পর্য্যন্ত তাঁ'র প্রাণে বিঁধিয়া থাকিবে।

সেইখানে সাতদিন থাকিয়া তাহাদের মুখে বাঘ ও মহিষের যে সব আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প শুনিলাম, সাহেব তা' 'আজগুবি' বলিয়া তখন হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন বটে, কিন্তু চতুর্থ দিন যে

কাণ্ড ঘটিল তা'তে প্রায় সকল গল্পই ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেন।

[৫]

আমরা যা'র বাড়ীতে ছিলাম, সেই লোকটি সে গ্রামের এক জন মোড়ল গোছের মানুষ। বিপদে-আপদে, সুখ-দুঃখে গাঁয়ের অন্য লোকেরা তার কাছে ছুটিয়া আসিত।

সে দিন প্রায় শেষ রাত্রে হঠাৎ একটা গোলমালে আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সাহেব তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন—"খবর নাও গোল কিসের ?"

কিন্তু আমাকে আর কষ্ট করিতে হইল না। পরক্ষণেই একটা ছোঁড়া চাকরকে কান ধরিয়া সেইখানে টানিয়া আনিয়া সেই গৃহস্থ ও তার পুত্র ধম্‌কাইয়া বলিল—"বাচ্চা ভইসটাকে ঘরে তুলিস্‌নি কেন ?"

সে কাঁদিতে কাঁদিতে জবাব করিল—"আমার কসুর নেই হুজুর, আমি মনুয়াকে বলেছিলুম, সে তা'কে ঘরে তুলতে ভু'লে গেছে।"

জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম যে, শেষ রাত্রে মহিষের বাচ্চাটাকে বাড়ীর উঠান হইতে বাঘে ল'য়ে গেছে।

গৃহস্থের ছেলে বলিল—"উঠানে অত ভইসের ভিতর থেকে বাঘের বাবারও সাধ্য নেই যে বাচ্চাটাকে নিয়ে যায়। নিশ্চয় সে একেলা কোন রকমে বাহির বাড়ীতে গিয়ে পড়েছিল।"

অনুসন্ধানে জানা গেল যে তাহাই সত্য। এমন কি, বাহিরের উঠানের যায়গায় যায়গায় বাঘের পায়ের দাগ ও রক্তের ছিটা দেখিতে পাওয়া গেল।

গৃহস্থের ছেলে বলিল—"পায়ের দাগে বোঝা যাচ্ছে বাঘটা বড়। ঠিক এমনি কাণ্ড—গেল হপ্তায় ভোলা মিশিরের বাড়ীতে হয়েছে। এ বাঘটাকে মার্‌তে না পার্‌লে গাঁয়ের ভালাই নেই। এখুনি চল সবাই—বন ঢুঁড়ে দেখ্‌তে হবে।"

সেই কথা শুনিয়া সাহেবেরও উৎসাহ বাড়িল, তিনি সকলকে আশ্বাস দিয়া বন্দুক দোরস্ত করিতে বসিলেন।

ঘণ্টাখানেক পরেই সকাল হইল। গৃহস্থের কথায় খাওয়া-দাওয়া সারিয়া লইয়া আমরা দু'জন যখন বন্দুক হাতে করিয়া বাহির হইলাম, তখন বেলা প্রায় এগারটা। গাঁয়ের প্রায় সকল লোক লাঠি-সোঁটা হাতে লইয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

বেলা ন'টার ভিতরেই দুধ দুহিয়া লইয়া গৃহস্থ তা'র মহিষের পালগুলিকে বনের দিকে খেদাইয়া দিয়াছিল। আমরা সে পথে না গিয়া অন্য পথে বনের দিকে চলিলাম।

গৃহস্থের ছেলে আমাদের সঙ্গে ছিল। সে বলিল—"এদিকটাতে অল্প দূরেই গভীর বন, তাই এ পথে গাঁয়ের লোক কি ভইসের পাল যায় না।"

বনের প্রায় সামনে গিয়া সাহেব গ্রামের লোকগুলিকে বনের তিন দিকে পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন—"তোমরা তিন দিক

থেকে হল্লা কর্‌তে কর্‌তে এই দিকে এসো। আমরা তিন জন সোজা এই পথে বনে ঢুক্‌বো।”

সাহেবের হুকুমে গাঁয়ের লোকেরা বন ঘিরিবার জন্য চলিয়া গেল। সাহেব, আমি ও গৃহস্থের ছেলে—তিনজনে অপর দিক্ দিয়া বনের ভিতর ঢুকিলাম।

কিন্তু ক্রমাগত মাইল দুই কি তারও বেশী গিয়া বাঘের চিহ্ন পর্য্যন্ত কারও নজরে পড়িল না। আমরা এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া আরও আগাইয়া যাইতে লাগিলাম।

প্রায় আধ মাইল পথ আরও গিয়া সাহেব হঠাৎ থম্‌কাইয়া দাঁড়াইলেন। আমরা কিছু বুঝিতে না পারিয়া তাঁর মুখের পানে চাহিলাম। তিনি ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন—“ওই দেখ।”

বাস্তবিকই প্রায় রশিখানেক তফাতে একটা ঝোপের কাছে কি কতকগুলো ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সাহেব বলিলেন—“সম্ভব ওইখানেই ব’সে মহিষের বাচ্চাকে খেয়েছে, বাঘ নিশ্চয়ই কাছা-কাছি কোনও ঝোপে আছে।”

সেই সময় কাছেই ঘণ্টার শব্দ হইল। গৃহস্থের ছেলে বলিল—“নিশ্চয় কোন ভইস পাল ছাড়া হয়ে এ দিকে এসেছে।”

“আগে দেখ কোন দিকে।”—বলিয়া সাহেব আমাকে ইসারা করিয়া কাছের ঝোপটা সন্ধান করিয়া দেখিতে ব্যস্ত হইলেন। আমিও তেমনি দেখিতে দেখিতে খানিকটা আগাইয়া গিয়া পড়িলাম।

গৃহস্থের ছেলে ততক্ষণে একটা উঁচু গাছে উঠিয়াছিল। সে হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিল "ভাই, তোমারই কাছে, আর একটু ডাইনে—ভইস—একটা নয়—এক পাল।"

তার কথা শেষ হইতে না হইতেই হঠাৎ বন্দুকের শব্দ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে গর্জ্জন করিয়া আমার সুমুখে—প্রায় বিশ হাত তফাত দিয়া একটা প্রকাণ্ড বাঘ এক লাফে বিদ্যুতের মতো দেখা দিয়াই অদৃশ্য হইয়া গেল।

সাহেব নিরাশ হইয়া স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। আমি ছুটিয়া তাঁ'র কাছে যাইতেই তিনি বলিলেন—"সর্ব্বনাশ করেছি—ভুলে এ ব্যাগে রাইফেলের টোটা নেই, কেবল বাক্‌শট্‌৺

তখন বেলা প্রায় তিনটা পার হইয়া গিয়াছিল। ততদূর পথ ফিরিয়া ঘরে গিয়া টোটা লইয়া আসিবার সময় ছিল না। সাহেব বলিলেন—"এখন শুধু শুধু ফিরে যাওয়া ভিন্ন আর উপায় নেই, বাঘকে আর পাওয়া যাবে না—অথচ ব্যাটা ঘা খেয়েছে, সাংঘাতিক হয়ে উঠবে। ছি ছি—এ কি আমার অন্যায় ভুল হলো।"

আমি সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম—"ভুল মানুষেরই হয়ে থাকে—ভূতের হয় না—এটা স্বাভাবিক—আক্ষেপ করবার কারণ নেই।"

সাহেব কিন্তু সত্য সত্যই আত্মধিক্কারে একেবারে মুস্‌ড়িয়া পড়িলেন। আমরা দু'জনে অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা রকম বুঝাইয়া তাঁ'কে কতকটা শান্ত করিলাম।

এ দিকে, কোথা দিয়া যে বেলা পড়িয়া আসিতেছিল সে দিকে কা'রও নজর ছিল না। গৃহস্থের ছেলে সভয়ে বলিয়া উঠিল—

"ইস্ বনের ভিতরে অন্ধকার হ'য়ে আসছে যে, শীগ্‌গির চলুন, এর পরে বেরোনো মুস্কিল হবে।"

বাস্তবিকপক্ষে ঘটিলও তাই। মনের অস্থিরতায় তাড়াতাড়ি বনের বাহির হইতে গিয়া আমরা পথ হারাইয়া ফেলিলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক এদিক্-ওদিক্ ঘুরিয়া আসিয়া পড়িলাম এক পাল মহিষের কাছে।

গৃহস্থের ছেলে বলিল—"সেই ভইসের পালটা চর্‌তে চর্‌তে এখানে এসে জমেছে দেখ্‌ছি।"

আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখন আমাদের উপায় কি ? শীগ্‌গির বেরোতে না পারিলে যে বাঘের পেটে যেতে হবে।"

গৃহস্থের ছেলে বলিল—"আজ আর বেরোবার আশা ছে'ড়ে দাও ভাইয়া, কি রকম আঁধার ঘনিয়ে এসেছে দেখছো না ? কিন্তু বাঘের ভয় ক'রোনা, আমরা পালের ভিতর এসে পড়েছি—বাঘের বাবাও কিছু কর্‌তে পার্‌বে না।"

সাহেব সে কথা বিশ্বাস করিলেন না,—হাসিয়া আমাকে বলিলেন—"সাহেবেরা মর্‌তে ডরায় না, আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েছি—আমার যোগ্য শাস্তিই তাই। কিন্তু দুঃখ তোমার জন্য।"

আমিও জবাব করিলাম—"এতকাল তোমার সঙ্গে কাটিয়ে তোমার গায়ের হাওয়াটাও কি আমার গায়ে লাগেনি সাহেব ? যদি তেমন ঘটে তো দেখে নিও, মর্‌তে আমিও ডরাই না। তবে বাঘের পেটে যেতে হবে—এই যা—"

কথা শেষ হইতে না হইতেই হঠাৎ বন কাঁপাইয়া বাঘের ভীষণ গর্জ্জন উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে যে আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিল, তাহা বাস্তবিকই যেন মনে হ'ল ঠাকুরমা ও ঠাকুরদাদার রূপকথার গল্প।

বাঘের গর্জ্জন উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই ঠন্-ঠন্—ঠন্-ঠন্ করিয়া ক্রমাগত ঘণ্টার শব্দ উঠিতে লাগিল। আশ্চর্য্য হইয়া আমরা চাহিয়া দেখিলাম যে, পালের বড় বড় মহিষগুলি আমাদের চারিদিকে পিছন করিয়া গোলাকারভাবে বেড়ার মতো ঘিরিয়া বনের দিকে মাথা করিয়া পাশাপাশি দাঁড়াইয়া পড়িল। মাঝখানে রহিলাম আমরা তিনটি মানুষ। আর দুইটি মহিষের বাচ্চা আমাদের কাছেই নিশ্চিন্ত মনে মাটীতে গা ঢালিয়া নির্ভয়ে জাবর কাটিতে লাগিল।

গৃহস্থের ছেলে বলিল—"দেখুন ঠিক বলেছিলুম কি না? বাঘের বাবার সাধ্য কি যে, এই কেল্লার ভিতর থেকে আমাদিগকে নিয়ে যায়? অথচ এই ভইস্‌ই লাল কাপড় আর খোলা ছাতা দে'খে সে দিন আপনাদিগকে মার্‌তে তাড়া করেছিল।"

সাহেব অবাক্ হইয়া পশুদিগের সেই কাণ্ড দেখিতে লাগিলেন। বোধ করি তাঁর চোখে দু-এক ফোঁটা জলও দেখা দিয়া থাকিবে। তিনি গাঢ়স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"ধন্য ঈশ্বর! ধন্য তোমার মহিমা! ইতর পশুদের চেয়ে মানুষ শ্রেষ্ঠ কিনা, তা'তে আজ আমার সন্দেহ হচ্ছে।"

বাস্তবিকই, আধঘণ্টাও কাটিল না—আবার ভীষণ গর্জ্জনে বন কাঁপিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড এক বাঘ লাফাইয়া আসিয়া আন্দাজ বিশ হাত দূরে থাবা পাতিয়া বসিল।

মহিষের দল কিন্তু কিছুমাত্র চঞ্চল হইল না, তারা ঠিক একই ভাবে বেড়ার মতো আমাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া নিশ্চিন্ত মনে জাবর কাটিতে লাগিল।

বাঘটা মাঝে মাঝে উঠিয়া—তেমনি তফাত হইতেই—এক এক বার চারিদিক দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার এক এক জায়গায় থাবা পাতিয়া বসিতে লাগিল। কিন্তু মহিষের দল তাহা গ্রাহ্যও করিল না, সমান ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সারারাত্রি সেইভাবে কাটাইয়া ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে একটা নৈরাশ্যের গর্জ্জন ছাড়িয়া বাঘটা বনের ভিতর অদৃশ্য হইল। মহিষগুলিও তখন তাহাদের সেই বেড়া ভাঙ্গিয়া আশে-পাশে ছড়াইয়া পড়িল। আমরাও পশুর কৃপায় জীবন রক্ষা করিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম।

বরাতের ফের

[১]

বাখরগঞ্জ জেলার কাছাকাছি একটা তালুক পত্তনি লইবার ইচ্ছায় কলিকাতার কোন বড় মানুষ যখন একজন আমীন বহাল করিয়া তাঁহার ম্যানেজারকে সঙ্গে দিয়া সেই তালুকটা জরীপ করিতে পাঠাইলেন, তখন ম্যানেজার বাবু যে রকম উৎসাহে হ্যাট-কোট পরিয়া পেয়দা-আরদালি প্রভৃতি সহচর লইয়া চুরুট ফুঁকিতে ফুঁকিতে সদম্ভে গ্যাট্‌-ম্যাট্‌ করিয়া যাত্রা করিলেন—ফিরিবার সময়ে তার চিহ্নমাত্রও রহিল না।

ম্যানেজার বাবু ছেলেবেলাতেই মা-বাপ-হারা। পৃথিবীতে আপনার বলিতে একমাত্র বড় বোন ছাড়া তাঁহার আর কেউ ছিল না। তাঁহারও সন্তান না থাকায় অতিরিক্ত আদর-যত্নে দিদির কাছে মানুষ হইয়া তিনি একেবারে পূরোদস্তুর সাহেব হইয়া উঠিয়াছিলেন।

তাঁর ভগ্নীপতি বাখরগঞ্জ অঞ্চলের কোন জমিদারের কাছারীতে নায়েবী করিতেন। কাজেই শৈশব হইতে সেই অঞ্চলে থাকায় সেখানকার সকল ব্যাপারই তিনি ভাল রকম জানিতেন। পড়া-শুনা যত হোক্‌ বা না হোক্‌; সাহেবী চাল-চলনের সঙ্গে সঙ্গে শিকারেও তাঁহার নাম ছিল বেশ।

বাখরগঞ্জ জেলায় বাঘের অভাব না থাকিলেও কেউ কখনো তাঁকে বাঘ শিকার করিতে দেখে নাই। কিন্তু তেমন সুযোগ সুবিধা

পাইলে তিনি যে অনায়াসেই বাঘ মারিতে পারেন, একথা সকলেই বলাবলি করিত।

বাস্তবিকই বাঘ-ভালুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু মারিবার মতো 'রাইফেল' বন্দুক প্রভৃতি সরঞ্জামের তাঁর অভাব ছিল না। বাঘ শিকার করিবার নামে তিনি উৎসাহে লাফাইয়া উঠিতেন।

কিন্তু, ভগ্নীপতির চেষ্টায় ম্যানেজারী চাকরী পাইয়াও শিকারের অভাবে তিনি মন্-মরা হইয়া থাকিতেন। তাই, তাঁর মনিব যখন ওই তালুক পত্তনি লইবার কথা তুলিয়াছিলেন, তখন তিনি উৎসাহে মাতিয়া সেখানকার জমিদারের সঙ্গে চিঠি-পত্র লিখিয়া কাজটা এক রমম্ পাকা করিয়া নিজেই আমীন সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিবার সকল আয়োজন ঠিক্ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তা'ছাড়া—মায়ের মতো দরদী দিদির সঙ্গে দেখা করিবার আশাও যে তাহারা মনের ভিতর প্রবল হইয়া জাগে নাই, এমন কথাও বলা যায় না।

দিদিকে সেই খবর লিখিয়া তিনি যখন লোকজন ও জরীপের যন্ত্রপাতি এবং বন্দুক প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন, তখন তাঁর মনিব বলিলেন—"একটু সাবধানে চলা-ফেরা কর্‌বেন দত্ত সাহেব, শুনেছি সেখানে বাঘের রাজত্ব।"

দত্ত সাহেব হাসিয়া বলিলেন—সেইজন্যই তো তালুকটার ওপোর আমার এত ঝোঁক, কি সুন্দর বাঘের চমড়া এনে দেব দেখবেন,—সাহেব-সুবো দেখে হাঁ ক'রে থাক্‌বে!

[২]

যাঁদের তালুক, সেই অঞ্চলে সেই জমিদারের একটা কাছারী ছিল—সেখানে অনেকগুলি পাইক-পেয়াদা ও একজন নায়েব থাকিতেন—তিনি মুসলমান। দত্ত সাহেব লোকজন সহ পৌঁছিলে, সেখানে যেন একটা মহাসমারোহ পড়িয়া গেল।

তিন চার দিন খুব আমোদ-আহ্লাদ ও খাওয়া-দাওয়ার পর দত্ত সাহেব প্রথম যেদিন তালুক দেখিতে যাইতে চাহিলেন, তখন নায়েব বলিলেন—"দেখুন, আপনারা কল্‌কাতার লোক তাই সাবধান ক'রে দিচ্ছি। তালুকটাতে বাঘের ভয় খুব বেশী। কিন্তু তার জন্য আপনারা কিছু ভাব্‌বেন না, পাইক্‌-পেয়াদা যথেষ্ট সঙ্গে দেবো।"

নায়েবের কথা শেষ হইতে না হইতেই দত্ত সাহেব বলিয়া উঠিলেন—"বলেন কি মশাই, বাঘ দেখে ভয় পাব আমরা? শিকারের সুযোগ মিলবে বলেই যে আপনাদের এই তালুকটা আমাদের পত্তনি নেওয়া! কল্‌কাতায় থে'কে থে'কে আমার এমন দামী রাইফেলটা মরচে ধ'রে গেছে দেখছেন না? বাঘ শিকারেই ছেলাবেলা থেকে আমার ঝোঁক বেশী, কিন্তু বরাতের বিড়ম্বনা—পড়ে আছি কল্‌কাতায়।"

"তা এখানে তা'র অভাব হবে না" বলিয়া নায়েব হাসিয়া কহিলেন—তবু সাবধান থাকা ভাল, তবে কি জানেন, এই বাঘ কখন যে কোথা থেকে এসে পড়্‌বে তার কিছুই বলা যায় না।

এই কাছারীতেও এসে যে সময় সময় উৎপাত না করে, এমন নয়। এখানে দু'চারদিন থাক্‌লেই তা' দেখ্‌তে পাবেন।

'এঁ্যা, বলেন কি ?'—বলিয়া আমীন বাবু নায়েবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখানে কি বাঘ আছে মশাই ?"

নায়েব হাসিয়া জবাব করিলেন—"যে রকম খুঁজ্‌বেন সব রকম। ছোট ছোট নেকড়ে থেকে চিতা, গুলবাঘা, এমন কি বড় বড় ডোরা বাঘ—যাকে 'রয়াল টাইগার'—'রাজবাঘ' বলে তারও অভাব নেই।

আমীন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"সুন্দরবনের বাঘের কথা বল্‌ছেন না কি ?"

নায়েব বলিলেন—"আজ্ঞে হাঁ! সুন্দরবন তো ওপাশাহে! ব্যাটারা প্রায়ই রাত্রে এই অঞ্চলের সব বস্তির ভিতর আসে। আর নেকড়ে, কি চিতা সে তো আমাদের পড়শী। আমি মফঃস্বল তদারকে বেরোলে প্রায়ই দেখ্‌তে পাই ঝোঁপ-ঝাড়ের ভিতরে চিতাবাঘ তা'র বাচ্চাগুলি নিয়ে বেড়ালের মতো খেলা কর্‌ছে—নয় তো শিকারের চেষ্টায় ওৎপেতে আছে। সেগুলো মানুষের সাড়া পে'লে স'রে যায়। কিন্তু ওই বড় বড় ডোরাবাঘই সর্ব্বনেশে।

দত্ত সাহেব বলিয়া উঠিলেন—"তা, বন্দুক রাখেন না কেন ?"

এবার নায়েব একগাল হাসিয়া জবাব করিলেন—"বন্দুক কি একটা ? তিনটে বন্দুক, আর দু'জন মাইনে করা শিকারী হামেসা হাজির আছে, তবু তো কিছুই হয় না। একটা বাঘ

মানুষের রক্তের স্বাদ পে'য়ে একেবারে হন্নে হ'য়ে উঠেছে—সে ব্যাটা রোজই রাত্রে বস্তিতে আসে। ফি হাটবার একজন ক'রে মানুষ যেন তার বরাদ্দ করা আছে, গেল হপ্তায় এই কাছারী বাড়ীর পুকুর ধার থেকেই একটা চাষার ছেলেকে নিয়ে গেছে। তাই সাবধান করে দিচ্ছিলুম্।

একজন শিকারী কাছে দাঁড়াইয়া এ সব কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। সে বলিল—"সেই বাঘটাকে যদি মারতে পারেন সাহেব, তা হ'লে এ অঞ্চলের প্রজারা সকলেই আপনার কেনা গোলাম হ'য়ে থাক্‌বে।

দত্ত সাহেব সগর্ব্বে বলিলেন—"আর ভয় নেই, এতদিনে ব্যাটার মরণ ঘনিয়েছে, আমি তা'র যম এয়েছি। আমারও একটা ভাল চামড়ার দরকার—কথা দিয়ে এয়েছি—চামড়া আমাকে নিয়ে যেতেই হবে। আচ্ছা সেটা দেখ্‌তে কেমন? তোমরা কেউ দেখেছ?"

শিকারী বলিল—"আজ্ঞে দেখেছি বৈ কি, অনেকেই দেখেছে। দেখ্‌তে ভারী সুন্দর, চমৎকার চামড়া পাবেন। সাধারণ বাঘ নয়—সাত-আট হাত লম্বা, উঁচুতে প্রায় হাত তিনেক, গায়ে বেশ মোটা লম্বা লম্বা ডোরা—আসল রাজবাঘ। গায়েও ব্যাটার তেমনি জোর, একটা বড় মহিষকে অনায়াসে মুখে ক'রে নদী পেরিয়ে চ'লে যায়। দু'বার ব্যাটাকে কায়দায় পে'য়ে গুলি ক'রেও কিছু কর্‌তে পারিনি। ব্যাটা যেন সাক্ষাৎ যম। তা'র ডরে বিকাল হ'লে এখানকার বস্তির লোকেরা আর পথ-ঘাটে বেরোয় না।

দত্ত সাহেব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—সে রকম আর ক'টা বাঘ আছে ? আমার গোটা তিনেক চামড়ার দরকার।

আজ্ঞে, এ সুন্দরবন। এখানে ডোরা বাঘের অভাব কি ? তালুকে বেরোলেই দেখ্‌তে পাবেন—যত্ত মার্‌তে পারেন। তবে এই এক ব্যাটা মানুষখেকো হ'য়ে এ অঞ্চলের সর্ব্বনাশ সুরু কর্‌ছে। দেখুন,—যদি আপনার হাতে এর নিয়তি ঘনিয়ে থাকে ?—বলিয়া শীকারী মুখ ফিরাইয়া একটু আড়ে হাসিল।

দত্ত সাহেবের উৎসাহ আর দেখে কে ? পরদিন তাঁ'র দিদির বাড়ীতে যাইবার কথা ছিল। কিন্তু তিনি তা' বন্ধ করিয়া দু'জন পাইক ও চিঠি পাঠাইয়া তাঁহাকে আনাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তারপর তালুকে যাইবার যোগাড়-যন্ত্র করিতে এমন ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন যে, সারাদিনের ভিতর আর তাঁর অবকাশ রহিল না।

দত্ত সাহেবের দিদি আসিবেন বলিয়া নায়েব মহাশয়ও পৃথক ঘর এবং আহারাদির পৃথক বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতে কসুর করিলেন না।

[৩]

সেই তালুকটা জমিদারের কাছারী-বাড়ী হইতে ক্রোশ তিনেক দূরে। পরদিন আহারাদি সারিয়া লইয়া জরীপের যন্ত্রপাতি, জন ছয় পেয়াদা, একজন শিকারী, গোটাতিনেক বন্দুক ও আমীন বাবুকে সঙ্গে লইয়া দত্ত সাহেব যখন তালুকে

যাইবার জন্য বাহির হইলেন, তখন বেলা দু'পর হ'য়ে গেছে। বিকাল নাগাদ দিদি আস্‌তে পারেন ভাবিয়া তিনি তাঁর অভ্যর্থনা ও বিধি-ব্যবস্থা করিবার জন্য খোদ নায়েব ও তাঁহার প্রিয় খান্‌সামা 'রঘুয়া'কে কাছারীতে রাখিয়া গেলেন।

ক্রোশ দেড়েক পথ পর্য্যন্ত যায়গায় যায়গায় চাষাদের বস্তি, ছোট ছোট গ্রাম, পাটের ক্ষেত, ধানের জমি, মাঠ ও ছোটখাট ঝোপ-জঙ্গল পার হইয়া যাইবার পর তাঁহারা এমন একটা ফাঁকা জলা জমিতে আসিয়া পড়িলেন যে, কাছাকাছি কোথাও আর বসতির চিহ্নমাত্রও নাই। চারিদিকেই কেবল জলা, জঙ্গল, আর তার কিছু পরেই উঁচু-নীচু মাঠ, মাঠেও কেবল বন-জঙ্গল আর ঝোপ-ঝাড়। তার মাঝে মাঝে কোথাও সরু খালের মত নালা, তাহাতে অল্প অল্প জল আর কাদা, আবার কোথাও বা নীচু যায়গায় পঁচা জল জমিয়া আছে তাহাতে হোগলার মত লম্বা লম্বা ঘাসের জঙ্গল। তারই ভিতর দিয়া আঁকা-বাঁকা সরু পথ সেই তালুকের দিকে চ'লে গেছে।

সেই পথের ধারে একটা যায়গায় ছোট পাহাড়ের মতো মাঝারি গোছের একটা উঁচু ঢিবি ছিল। সেই ঢিবিটা পার হইয়া গিয়া সঙ্গীয় পেয়াদারা দত্ত সাহেবকে বলিল—"দেখুন, বেলা গড়িয়ে পড়েছে, এই যায়গাটায় বেজায় বাঘের ভয়। বিশেষ ওই যে দূরে উঁচু ঢিবিটা দেখ্‌ছেন ওর ডাইন দিয়ে যে সরু পথটা গেছে, ওই পথেই আপনার দিদি ঠাক্‌রুণ আস্‌বেন। তারপর এই পথ ধ'রে কাছারীতে যাবেন। ওই বাঁ দিকে মাইলখানেক তফাতে

চার পাঁচ ঘর বাগ্‌দী প্রজা আছে—সেইখানে সন্ধ্যার আগে না পৌঁছিতে পার্‌লে—

বাধা দিয়া দত্ত সাহেব বলিয়া উঠিলেন—"বাঘে নেবে ? আমি তো তাই চাই। আসুক্ না দেখি তোমাদের কেমন সেই বাঘ ? এই রাইফেল দেখ্‌ছিস্ ? হোক্ সন্ধ্যা—চাঁদনী রাত আছে—ভয় কি ? তিনটে বেজে গেছে, এখন চা না খে'য়ে আর এক পা এগোচ্ছিনি। যদি বাঘ আসে—মন্দ কি ! তার হেকমৎ বোঝা যাবে।

সঙ্গীয় লোকেরা আর জবাব করিল না। দত্ত সাহেব তাঁর সঙ্গের একজন পেয়াদাকে চা করিতে বলিয়া একটা পরিষ্কার যায়গা দেখিয়া ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

সঙ্গে ষ্টোভ, কেট্‌লি প্রভৃতি চায়ের সরঞ্জাম সমস্তই আসিয়াছিল। একজন পেয়াদা সেইগুলি লইয়া অল্প তফাতে আর একটা ঝোপের ধারে চা করিতে বসিয়া গেল। অন্য পেয়াদাগুলিও তা'র পিছনে পিছনে গিয়া সেইখানে বসিয়া সভয়ে এদিক্ ওদিক্ চাহিতে লাগিল।

আমীনবাবু নিরুপায় হইয়া দত্ত সাহেবের কাছে বসিয়া বলিলেন—"এখানে শুধু শুধু দেরী করা কি ভাল ? শুন্‌লেন্ তো যায়গাটা ভাল নয়। ওরা এখানকার মানুষ, এখানকার ব্যাপার আমাদের চেয়ে ওরা বেশী জানে।"

হা-হা করিয়া উচ্চ হাসিয়া দত্ত সাহেব বলিলেন—"ভয় পেয়ে গেলে বুঝি আমীন বাবু ? তবেই তুমি এই তালুক জরীপ করেছ !

আরে দিনের আলো থাক্‌তে বাঘ বেরোবে না—নিশ্চিন্ত থাক। আমিও ছেলে বেলাটা এই সব অঞ্চলে কাটিয়ে গেছি। ওদের চেয়ে আমারও জানা শুনা বড় কম নেই।”

বিশেষ লজ্জা পাইয়া—আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া—আমীন বাবু বলিলেন—“আজ্ঞে না, সে জন্য বলিনি, আরও ক্রোশখানেক না গেলে তো তালুকে পৌঁছিতে পার্‌বো না, রাস্তা তো দেখ্‌ছেন এই। তাই বল্‌ছিলুম, যত শীগ্‌গির সেখানে পৌঁছিতে পারা যায়, ততই ভাল।”

দত্ত সাহেব আবার বলিলেন—“যাচ্ছি হে, অত ব্যস্ত কেন? তালুকে যেতেই তো বেরিয়েছি। চা’টা খেয়ে নিতে আর কত দেরী হবে? জোর আধ ঘণ্টা—কি বল? আর সত্যি কথা বল্‌তে কি, ওই পথে দিদি আস্‌বেন শুনলে তো? যদি এর ভিতরে এসে পড়েন দেখাটা হয়ে থাকবে, সেইটেই হচ্ছে আসল কথা—বুঝ্‌লে? তুমি ওইখানে গিয়ে দেখ, ব্যাটারা আনাড়ী—চা করতে পাচন সিদ্ধ করে না বসে?

“তা মিছে না” বলিয়া হাসিতে হাসিতে আমীন বাবু উঠিয়া চায়ের তদারক করিবার জন্য পেয়াদাদের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন।”

[৪]

কিন্তু তবু চা শীঘ্র তৈয়ার হইল না। সেই ফাঁকা জলার বাতাসে দত্ত সাহেবের ষ্টোভটি এমন বাঁকিয়া বসিল যে, জল ফুটিয়া চা হইতে বোধ করি ঘণ্টাখানেকেরও উপর সময় কাটিল।

শেষে প্রাণ ভরিয়া চা খাইয়া দত্ত সাহেব যখন একটা মস্ত আরামের নিশ্বাস ফেলিলেন তখন সত্যই বেলা অনেকখানি গড়াইয়া আসিয়াছিল।

চা খাওয়া শেষ করিয়া একটা চুরুট ধরাইয়া ডান হাতে রাইফেল বন্দুকটা লইয়া দত্ত সাহেব হুকুম করিলেন—"তা'হলে ওঠ—এইবার চলা যাক্।"

পেয়াদারা ব্যস্ত হইয়া জিনিসপত্র গুছাইয়া কাঁধে লইল। কিন্তু ওই পর্য্যন্ত তাদের আর আগাইয়া যাইতে হইল না।

যেমন সকলে চলিতে যাইবে, অমনি দূর হইতে একটা অদ্ভুত হুম্ হুম্ শব্দ উঠিল। সকলেই চম্কাইয়া সেই দিকে চাহিয়া দেখিল,—দুইজন বেহারা কাপড়ে ঢাকা একটা ডুলি কাঁধে করিয়া গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া তাড়াতাড়ি আসিতেছে; তাদেরই মুখ হইতে শব্দ বাহির হইতেছে হুম্ হুম্ হুম্। আগে আগে মোটা লাঠি হাতে পাগড়ী বাঁধা একটা মানুষ—ডুলির পিছনে আরও দুইজন তেমনি বেহারা—তেমনি তাড়াতাড়ি ছুটিতেছে।

দেখিবামাত্র দত্ত সাহেব আহ্লাদে চেঁচাইয়া উঠিলেন—ওই দিদি আস্‌ছেন নিশ্চয়! দাঁড়াও!

সকলেই থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া সেই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। পথের মাঝামাঝি সেই উঁচু ঢিবি। ডুলিখানা এক একবার সেই ঢিবির আড়ালে পড়িয়া অদৃশ্য হইতেছে—আবার পরক্ষণেই বাহির হইয়া আসিতেছে। ক্রমে তাহারা ঢিবিটার প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। তা'দের রকম সকম

আর বেহারাগুলোর সেই অদ্ভুত মুখের শব্দ শুনিয়া সকলেরই ভয়-ভাবনা দূরে পলাইল, সকলেই প্রায় এক সঙ্গে হো হো করিয়া উচ্চহাসি হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু হায়, তাদের হাসির রেশ বাতাসে মিশাইতে না মিশাইতেই আচম্বিতে আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া হঠাৎ এক ভীষণ গর্জ্জন উঠিল। পেয়াদাদের কথা দূরে থাকুক, খোদ দত্ত সাহেব পর্য্যন্ত হতভম্ব হইয়া কাঠের পুতুলের মতো আড়ষ্ট হইয়া গেলেন।

ওদিকে বেহারাগুলো গর্জ্জন উঠিবামাত্র তাড়াতাড়ি সেই ঢিবিটার কাছে একটা উঁচু যায়গায় ডুলিটাকে রাখিয়াই চোখের পলকে কে যে কোথায় লুকাইয়া পড়িল, তার ঠিকানা রহিল না। সুমুখের পাগড়ীধারী পাইকটা পর্য্যন্ত যেন কোন মন্ত্রের বলে কর্পূরের মতো উড়িয়া গেল।

পরক্ষণেই সকলে স্পষ্ট দেখিতে পাইল—প্রকাণ্ড একটা ডোরাকাটা বাঘ পাশের একটা ঝোপের ভিতর হইতে এক লাফে বাহির হইয়া ঠিক ডুলিটার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

সঙ্গের শিকারী তাড়াতাড়ি ফিস্‌ফিস্ করিয়া সকলকে বলিল—"বোসে পড়, ও সেই সর্ব্বনেশে শয়তান! এই বেলা সাহেব চালাও তোমার রাইফেল!"

দত্ত সাহেব রাইফেল চালাইবেন কি! সেই প্রকাণ্ড ডোরা বাঘের অতি ভয়ঙ্কর চেহারা দেখিয়া তাঁর বুক যে ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে-ছিল, তা' তাঁ'র মুখ দেখিয়া সঙ্গীদের বুঝিতে বাকী রহিল না।

শিকারী আবার বলিল—"কর কি সাহেব, আর দেরী কর্‌লে

সর্ব্বনাশ হবে। বাঘটা কেমন ক'রে ডুলিটার চারিদিক ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে একশোবার বেড়ালের মতো শুঁক্‌ছে—দেখ্‌তে পাচ্ছ না? মানুষের গন্ধ পেয়েছে কি না? খালি চারদিকে কাপড় ঢাকা রয়েছে বলে কিছু কর্‌তে পার্‌ছে না। এই বেলা চালাও গুলি।"

"এ্যাঁ—এ্যাঁ—এত কাছে—এত কাছে—"

"হাঁ—এত কাছে, বুঝেছি তোমার বিদ্যার দৌড়। দাও আমাকে ওই বন্দুকটা।"

—বলিয়াই শিকারী দত্ত সাহেবের হাত হইতে রাইফেলটা কাড়িয়া লইল। কিন্তু সে রাইফেলের কিছুই জানিত না বলিয়া হঠাৎ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না। সে সাহেবকে বলিল—"শীগ্‌গির জোড়বার কায়দাটা আমায় বুঝিয়ে দেও"।

কিন্তু দত্ত সাহেব তখন পর্য্যন্ত মাথা ঠিক করিতে পারেন নাই, কাজেই কিছুই করিতে পারিলেন না। তাঁর অবস্থা বুঝিয়া শিকারী আপনিই চেষ্টা করিয়া রাইফেল ছুড়িতে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে—কি ঘটিয়াছে দেখিবার জন্য দত্ত সাহেবের দিদিও ডুলির এক দিকের কাপড় খানিক খুলিয়া মুখ একটু বাড়াইয়া হাঁকিলেন—বেয়ারা, কই, কোথায় গেলি?

আর যায় কোথায়? চোখের পলকে সেই সর্ব্বনেশে শয়তান বিড়াল ছানার মতো দত্ত সাহেবের দিদির ঘাড় কাম্‌ড়াইয়া ধরিয়া এক লাফে বিদ্যুতের মতো অদৃশ্য হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে শিকারীর হাতের রাইফেলও গর্জ্জিয়া উঠিল—গুড়ুম!

হিপোর আক্রোশ

[১]

বুয়র যুদ্ধের পর চাকরী হইতে অবসর লইয়া এক কর্ণেল সাহেব সহকারী বন্ধু এক কাপ্তেন সাহেবকে সঙ্গে লইয়া সখের শিকারের জন্য যখন সুদূর আফ্রিকার বিখ্যাত 'অরেঞ্জ' নদীর তীরস্থ বিশাল বন-ভূমির ভিতর গিয়া ঢুকিলেন, তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে, ভয়াবহ যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সাংঘাতিক অস্ত্রও তাঁ'র যে দেহে আঁচড়টি পর্য্যন্ত লাগাইতে পারে নাই, সখের শিকারের খাতিরে সেই দেহে এমন ঘা খাইতে হইবে যাহাতে প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট হইতে পারে।

বড় বড় শিকারীর মুখে আফ্রিকার গভীর জঙ্গলের নানা রকম আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা ও কল্পনাতীত পশু-শিকারের বিচিত্র গল্পসকল শুনিয়া কর্ণেল সাহেবের শিকারের নেশাও এমন হইয়াছিল যে, তিনি তখন হইতেই শিকারে বাহির হইবার বিরাট আয়োজন করিয়া রাখিতে কসুর করেন নাই।

তারপর যুদ্ধের শেষে যেমন তাঁ'র পেন্‌সন্ হইয়া গেল, অমনি তাঁহার শিকারের সাজ-সরঞ্জাম ও আড়ম্বর দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল—"কর্ণেল সাহেব বুঝি বা তাঁর শেষ দিনগুলো 'অরেঞ্জের' তীরস্থ বনের ভিতরেই কাটাইয়া দিবেন।"

বাস্তবিকই শুধু শিকারের সরঞ্জাম কেন, একটা মস্ত বড় সংসার চলিতে পারে এমন সমস্ত জিনিসপত্রই সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে চলিল, আর চাকরবাকর, খানসামা-আরদালির তো কথাই নাই। সেই অঞ্চলের ভাল ভাল জন, দুই শীকারী, আর পথ দেখাইবার কালো চাকরও প্রায় চল্লিশ জন তীর, বল্লম, ঢাল, টাঙ্গি ইত্যাদি লইয়া সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইল।

প্রথম দিন কিন্তু মাইল দশেক যাইতেই বেলা পড়িয়া আসিল। সেদিন কর্ণেল সাহেবের হুকুমে সেইখানেই তাঁবু ফেলিয়া খাওয়া দাওয়া ও রাত্র কাটাইবার ব্যবস্থা হইল।

সেই দশ মাইলের ভিতর তেমন কোন পশু বা আশ্চর্য্যজনক কোনও ব্যাপার না দেখিয়া কর্ণেল সাহেব হতাশ হইয়া বলিলেন—"কই, এত রকম যে গল্প শুনেছিলুম, এর মধ্যে তা'র কিছুই তো দেখ্‌লুম না ?"

শিকারী দু'জন হাসিয়া বলিল—"হুজুর, সহরের কাছে ব'লে এসব যায়গায় শিকারীরা হামেসা আসে, এখানে কি পাবেন, আর দেখ্‌বেনই বা কি ? আগে নির্জ্জন দূর বনে চলুন।"

"তবে এ পথে এলে কেন ? আমি এমন যায়গায় যেতে চাই, যেখানে অন্য মানুষ যায় নি—পদে পদে বিপদ—পদে পদে আশ্চর্য্য ঘটনা! কালই এ পথ ছেড়ে সেই পথে চলবার ব্যবস্থা কর।"

"তাই হবে" বলিয়া শিকারী দু'জন পথ দেখাইবার কয়েক জন কালো চাকর ডাকাইয়া তা'দের ভাষায় কি বলাবলি করিল।

তখনি কালো চারজন লোক বনের চারিদিকে—কে জানে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। ঘণ্টা তিনেক পরে একে একে ফিরিয়া আসিয়া তাহারা বলিল—"হুজুর, কাল সকালে উঠে—ঐ দিকে আন্দাজ ষোল মাইল যেতে হবে।"

[২]

পরদিন ভোর হইতে না হইতেই সাহেবের তাড়ায় ছাউনি তুলিয়া আবার সকলে পথ চলিতে লাগিল। কিয়দ্দূর গেলে তা'রা সামনে প্রকাণ্ড এক বন দেখিতে পাইল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ আর নানা রকমের লতা—ফুল, ফলে অবনত হইয়া প্রায় মাটি পর্য্যন্ত নুইয়া পড়িয়াছে—ফুলের গন্ধে চারিদিক ভর্ ভর্ করিতেছে।

প্রকৃতির সেই বিচিত্র শোভা দেখিয়া কর্ণেল সাহেবের মন আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল। তিনি নানা রকমের ফুল তুলিতে তুলিতে স্থান, কাল সব ভুলিয়া গেলেন। কাপ্তেন সাহেব কিন্তু এ অবস্থায় অনেকখানি আগাইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁ'র সঙ্গে ছিল একজন শিকারী, আর দু'জন পথ প্রদর্শক কালো চাকর। তাহারা লতা ও ছোট ছোট গাছ কাটিয়া পথ করিয়া দিতেছিল।

হঠাৎ তা'দের ভয়ঙ্কর চীৎকারে বন কাঁপিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে দুইবার বন্দুকের শব্দ হইল—গুড়ুম্, গুড়ুম্! তারপরই সব চুপ।

কর্ণেল সাহেব চম্‌কাইয়া উঠিলেন, আর সঙ্গীয় শীকারীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি—কি?"

"কি করে জান্‌বো ? নিশ্চয় কোন বিপদ—"

বাধা দিয়া সাহেব এক নিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাপ্তেন,—কাপ্তেন সাহেব কোথায় ?"

"ওই দিকেই এগিয়ে গেছেন—ছুটে আসুন"—বলিয়া শিকারী ও সাহেব ছুটিয়া সেই দিকে চলিলেন। প্রায় আধ মাইল যাইবার পরেই হঠাৎ এক অদ্ভুত রকমের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের গোঙ্গানীর শব্দ উঠিল। মনে হইল—সাম্‌নের দিকের বন তোলপাড় করিয়া যেন কা'রা গাছ-পালাগুলো ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করিয়া ফেলিতেছে।

তখনো সে সব অঞ্চলে মাঝে মাঝে রাক্ষসের দল বনের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহাই মনে করিয়া সাহেব বলিলেন—"নিশ্চয় রাক্ষসের দল! বাঁচাও—কাপ্তেনকে বাঁচাও।"

এই বলিয়াই সাহেব বন্দুক উঠাইয়া পাগলের মত ছুটিলেন। শিকারীও তেমনি ছুটিয়া আগে আগে যাইতে লাগিল। হঠাৎ থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া সে লতার ফাক দিয়া একটা গাছের দিক দেখাইয়া সভয়ে বলিয়া উঠিল—"ওই দেখুন গরিলা, ওরাও রাক্ষসের চেয়ে কম নয়।"

সেই চেহারা দেখিয়াই কর্ণেল সাহেব সভয়ে কাঁপিয়া যখন গুলি করিতে যাইতেছিলেন, তখন শিকারী একটু সাম্‌নে যাইয়াই বলিয়া উঠিল,—"গেল, গেল, শীগ্‌গির আসুন।"

আর গুলি করা হইল না। কর্ণেল সাহেব চকিতে সেইখানে

ছুটিয়া যাইয়া যা' দেখিলেন, তা'তে মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

কাপ্তেনের সঙ্গে যে শিকারী ছিল, তাকে মাটীতে ফেলিয়া তিনটা বিকট চেহারার গরিলা তাহাকে মারিবার চেষ্টা করিতেছে, আর সে বেচারি মরণের সীমায় গিয়াও প্রাণ বাচাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। তার সারা দেহ হইতে রক্তের নদী বহিতেছে—চীৎকার করিবার শক্তি পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে,—মুখ হইতে কেবল একটা অস্পষ্ট গোঙ্গানীর স্বর বাহির হইয়া বাতাসে মিশাইতেছে। তার অল্প দূরেই বসিয়া তেমনি ভয়ানক চেহারায় আরো গোটা চারেক গরিলা তারই বন্দুকটা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে।

ইহা দেখিয়াই কর্ণেল সাহেব বন্দুক তুলিলেন। ঠিক সেই সময়ে শিকারী আবার বলিল—"ওদিকে দেখুন।"

সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন—কতকগুলো লতার জালে আটক পড়িয়া কাপ্তেন সাহেব সেখানে বন্দীর মতো রহিয়াছেন, মাথায় টুপি নাই, হাতে বন্দুক নাই, পোষাক টুক্‌রা টুক্‌রা। আর এক পাল গরিলা তাঁকে ঘিরিয়া মারিয়া ফেলিবার সূচনা করিতেছে।

ঠিক্ সেই সময় গরিলাদের হাতের বন্দুকটা টানা টানিতে হঠাৎ আপনা হইতেই আওয়াজ হইয়া গেল—গুড়ুম। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক চীৎকার করিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে একটা গরিলা পলাইয়া গাছে উঠিল।

সময় বুঝিয়া কর্ণেল সাহেব ও তাঁ'র শিকারী প্রায় এক সঙ্গে বন্দুক ছুঁড়িলেন—গুড়ুম—গুড়ুম!

অমনি এক সঙ্গে সমস্ত গরিলাগুলো ভয়ানক রাগে চীৎকার করিয়া সারা বন কাঁপাইয়া তুলিল বটে, কিন্তু শিকারীকে ও কাপ্তেনকে ছাড়িয়া দূরে পলাইল। সঙ্গে সঙ্গে দু'জনে আবার গুলি করিলেন—গুড়ুম—গুড়ুম! পলাইতে পলাইতে একটা গরিলা টলিয়া টলিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল, আর একটা গাছে লাফাইয়া উঠিয়াও ধপ্ করিয়া নীচে পড়িয়া গেল।

আরো দু'বার বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিবার পর গরিলার পাল চীৎকার করিয়া সেই অঞ্চল ছাড়িয়া পলাইল। কর্ণেল সাহেব বহু কষ্টে কাপ্তেনকে ছাড়াইয়া তাঁহাকে ও সেই শিকারীকে তাঁবুতে আনিয়া ফেলিলেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে কাপ্তেনের অপর সঙ্গী দু'জন, কতকগুলো জংলা লতা-পাতা লইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"আমরা পালিয়ে থাকায় প্রাণে বাঁচিয়াছি, নইলে রক্ষা থাকিত না। এইগুলো পিষে লাগিয়ে দিন, ঘাগুলো সেরে উঠ্‌বে।"

[৩]

বাস্তবিকই সেই বুনো লতাপাতার গুণে সপ্তাহখানেকের ভিতরেই দু'জনে আরাম হইয়া উঠিল। তারপর সেখান হইতে ছাউনি তুলিয়া ১৩ মাইল দূরে প্রকাণ্ড একটা ফাঁকা জমিতে গিয়া কর্ণেল সাহেব তাঁবু ফেলিলেন।

যেখানে তাঁবু পড়িল, তা'র চারিদিকে প্রায় আধ মাইলের ভিতর তেমন বনজঙ্গল কিছুই ছিল না, কেবল প্রকাণ্ড একটা দীঘির মতো জলা, আয়নার মতো ঝক্‌মক্ করিতেছিল। তার চারিদিকেই হোগলার মতো মোটা মোটা লম্বা ঘাসের বন। শিকারীরা বলিল—"এখানে ভাল শিকার মিলবে—পশুরা এই রকম যায়গাতেই এসে জল খায়।

সত্যই প্রথম দিন রাত্রি প্রহরখানেকের পরেই একপাল হরিণ আসিল বটে, কিন্তু জলের ধার দিয়াও কেউ গেল না। সাহেব দু'জন বিস্তর চেষ্টায় একটা বড় শিংওয়ালা হরিণ ও গোটা দুই সজারু মারিয়া ফুরতি করিয়া ভোজ লাগাইয়া দিলেন। শিকারীরা বলিল—"দিনকতক এখানে থাকতে হবে, ওই যে ছোট পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে—ওখানে অনেক রকম জানোয়ার মিল্‌তে পারে।"

সাহেবেরাও সেই কথা মতো সেইখানে ছাউনী রাখিয়া সকাল হইতেই শিকারী দু'জনকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

রাত্রে কিন্তু অসহ্য গরম পড়িল। সাহেব দু'জন তাঁবুর বাহিরে ক্যাম্প বিছাইয়া শুইলেন বটে, কিন্তু তাঁ'দের কাল চাকরগুলো সেই জলার কাছে একটা যায়গা সাফ করিয়া শয়ন করিল।

সকাল হইতেই সকলে বিষম আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে, চাকরদের মধ্যে দু'জন মানুষ মরিয়া রহিয়াছে—অথচ তা'দের গায়ে কোন রকম দাগের চিহ্নমাত্র নাই, কেবল পায়ের অঙ্গুলের কাছে

সামান্য একটু ফুলো। আর সমস্ত গা রক্তশূন্য—ছাইয়ের মতো সাদা।

সাহেবেরা নানা রকমে পরীক্ষা করিয়াও কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। সকলেই বলাবলি করিল—কোন রকম বিষফল খাইয়া মরিয়াছে।

পরের দিন সকাল হইতেই সকলে দেখিয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল যে—আরও চারি জন চাকর ঠিক তেমনি ভাবে মরিয়া আছে। তৃতীয় দিনেও আবার তিন জন চাকর মরিল। তখন চাকরদের ভিতর হুলুস্থূল পড়িয়া গেল, ভয়ে সকলেই কাজ ছাড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সাহেবেরা অনেক করিয়া বুঝাইয়া তা'দের ঠাণ্ডা করিলেন বটে কিন্তু মনে ঘোর সন্দেহ হইল।

সে রাত্রে সকলে শুইলে সাহেব শিকারী দু'জনকে লইয়া সেই জলার ধারে ধারে গিয়া ঘুরিতে লাগিলেন। কিন্তু রাত্রি তিন প্রহর কাটিয়া গেল, তাঁহারা কিছুই দেখিতে পাইলেন না। শেষে দু'জন যখন তাঁবুতে ফিরিয়া যাইবেন, তখন হঠাৎ অনেকখানি যায়গার ঘাস নড়িতে দেখিয়া শিকারীরা সাহেবকে সেই দিক দেখাইল। তাঁহারা দু'জনেই তাড়াতাড়ি গিয়া দেখিলেন যে, অনেকগুলো রবারের ফিতার মতো লম্বা লম্বা কি এক রকম আশ্চর্য্য প্রাণী জলা হইতে উঠিয়া লাফাইতে লাফাইতে ঘুমন্ত চাকরগুলোর দিকে যাইতেছে। কাপ্তেন চেঁচাইয়া উঠিলেন—"সাপ, সাপ।"

সেই শব্দমাত্রেই চোখের পলকে সেগুলো ফিরিয়া গিয়া জলে পড়িয়া অদৃশ্য হইল। সে রাত্রে আর কেউ মরিল না।

পররাত্রে শিকারীদের লইয়া জলার নিকটস্থ সেই যায়গায় গিয়া সাহেবেরা নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। ঠিক রাত্রি শেষ প্রহরের আরম্ভে আবার কতকগুলো তেমনি জীব জলা হইতে উঠিয়া তেমনি ভাবে লাফাইতে লাফাইতে ঘুমন্ত চাকরদের দিকে চলিল। সেদিন কেউ কোন শব্দ করিল না—কি বাধা দিল না।

সেই অদ্ভুত জীবগুলো বরাবর চাকরগুলোর পায়ের কাছে গিয়া দু'টো, তিনটা, চারটা করিয়া—এক এক জনের পায়ের অঙ্গুলে যেন আঠার মতো লাগিয়া গেল। তখন শিকারী দু'জন বলিয়া উঠিল—"সাহেব, ও জোঁক জোঁক—শয়তান জোঁক!"

সাহেবেরা গুলি করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু কি করিয়া গুলি করিবেন বুঝিতে পারিলেন না, বন্দুক তুলিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। শিকারীরা হাসিয়া বলিল—"গুলিতে ওরা মরবে না, ওদের গা ঠিক রবারের মতো।" "এই দেখুন" বলিয়াই একটা জোঁকের গায়ে জোরে জোরে বল্লম মারিল। কিন্তু বল্লম কেবলই লাফাইয়া উঠিতে লাগিল। শেষে চাকরগুলোকে জাগাইয়া সকলে মিলিয়া অতি কষ্টে দু'টোকে যখন মারিল, তখন অন্য জোঁকগুলো কখন যে পলাইয়া গেল তা' কেউ ভাবিয়া পাইল না।

সে দু'টোকে মাপিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে, লম্বায় চার ফিটেরও বেশী, চওড়ায় প্রায় দুই ইঞ্চি এবং মোটাতেও

ইঞ্চিখানেকের কম নয়। মানুষ বা জানোয়ারের রক্ত শুষিয়া খাইয়া সেগুলো যখন কাছির মতো মোটা হয়, মানুষের ও পশুর প্রাণও তখন দেহ ছাড়িয়া বাহির হইয়া যায়। সকলেই তখন বুঝিল যে, সেই জন্য কোন জানোয়ার সেখানে জল খাইতে আসে না। সাহেব সেই দিনই তাঁবু তুলিয়া বার মাইল দূরে নদীর একটা বাঁকের মুখে গিয়া ছাউনী ফেলিলেন।

[৪]

সে রাত্রে পরিষ্কার চাঁদের আলোতে নদীর জল যেন আহ্লাদে আটখানা হইয়া হাসিতেছিল। সাহেব দু'জন তাঁবুর সম্মুখে ইজিচেয়ারে গা ঢালিয়া দিয়া চুরুট টানিতে টানিতে আরামে গল্প করিতেছিলেন। কিছু দূরে তাঁদের চাকরের দল গোল হইয়া বসিয়া একটা বুনো মহিষের মরা বাচ্ছাকে ঝল্‌সাইয়া ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছিল।

হঠাৎ তা'দের ভিতর হইতে একজন তাড়াতাড়ি—প্রায় বুকে হাঁটিয়া আসিয়া—বলিল "হুজুর ওই সিংহ।"

সাহেব দু'জন চম্‌কাইয়া তাঁবুর পিছন দিকে চাহিয়া দেখিলেন—প্রায় আধ মাইল দূরে নদীর কাছাকাছি দুই-তিনটা বাঘ কি সিংহের মতোই কোন জানোয়ার খেলা করিতেছে। তখনি চুপি চুপি শিকারী দু'জনকে ডাকাইয়া সেই দিক দেখাইয়া দিলেন।

শিকারীরা মিনিট তিন চার ধরিয়া দেখিয়া বলিল—"বাঘও নয় সিংহও নয়।"

"তবে কি জানোয়ার হতে পারে ?—মহিষ ?"

"না—ওদের মুখ মহিষের মতো নয়—বড় ভয়ানক জন্তু, জলেই থাকে বেশী সময়—তবে সময় সময় ওপোরে ও ওঠে—ডাঙ্গাতেও চলা ফেরা করে। নদীতে ওদের পাল্লায় পড়্‌লে আর রক্ষা নেই।"

কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করিলেন—"হিপো না কি ?"

"আজ্ঞে হতে পারে।"

কর্ণেল আহ্লাদে লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—"তিন চারটে বাচ্ছা দেখছি,—মারা হবে না—ধরে আন্‌ একটা বাচ্ছাকে—নিয়ে যাব।"

"হুজুর, অমন হুকুম কর্‌বেন না—বড় ভয়ানক জানোয়ার, বাচ্ছা ধর্‌লে আর রক্ষা রাখ্‌বে না।"

"কুচ্‌ পরোয়া নেই—বাচ্ছা আন—দশ রূপেয়া বকশিস্‌।"

শিকারী দু'জন লোকজন সঙ্গে লইয়া গিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা অশেষ চেষ্টার পর কোন রকম করিয়া একটা বাচ্ছাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া চীৎকার করিল—"হুজুর আসুন !"

সাহেব দু'জনও তাড়াতাড়ি গিয়া বিস্তর কৌশলে বাচ্ছাটাকে ধরিয়া পায়ে শিকল দিয়া আনিয়া রাখিলেন তাঁবুর পিছনে একটা মোটা গাছে বাঁধিয়া। সে ভয়ে বিষম চীৎকার জুড়িয়া দিল।

সঙ্গে সঙ্গে নদীর ভিতর হইতেও এক রকম ভয়ানক গর্জ্জন ঘন ঘন উঠিয়া আকাশ-বাতাস কাঁপাইতে লাগিল এবং

ক্ষণপরেই নদীর তীরে সারি সারি প্রকাণ্ড চেহারার কতকগুলি অতি ভয়ানক ছবি, চাঁদের আলোতে হঠাৎ যেন স্বপ্নের মতো ফুটিয়া উঠিল। সাহেবেরাও উপরি উপরি কতকগুলো ফাকা আওয়াজ করিলেন। অমনি সে ছবি অদৃশ্য হইয়া গেল।

প্রায় রাত দু'পরের প'রে সাহেবেরা তাঁবুর ভিতর চলিয়া গেলেন, লোকজনেরাও যথাস্থানে শুইয়া ঘুমাইল। হিপোর বাচ্ছাটা মাঝে মাঝে এক একবার কেবল করুণ স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

শেষ রাত্রে হঠাৎ জাগিয়া কর্ণেল দেখিলেন, ঠিক যেন একটা তুফান বহিতেছে। পট্ পট্ দড়ি ছিঁড়িতেছে—থর্ থর্ তাঁবু কাঁপিতেছে—পড়ে—পড়ে আর কি! বাহিরেও নানা রকমের অদ্ভুত শব্দ!

তাড়াতাড়ি কাপ্তেনকে তুলিয়া দু'জনে বন্দুক লইয়া বাহির হইতে গেলেন; ঠিক সেই সময়ে হুড়্মুড়্ করিয়া অতবড় চৌকোণা তাঁবুটা তাঁহাদের ঘাড়ের উপর পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে কাপ্তেনের হাতের বন্দুকও আওয়াজ করিল—গুড়ুম!

মুহূর্ত্তের ভিতরেই যেন একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্নের ঘটনা ঘটিয়া গেল। তাঁবু চাপা পড়িয়া সাহেব দু'জন চেঁচাইতে চেঁচাইতে বাহির হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু আধ ঘণ্টার আগে কিছুতেই তা' ঘটিয়া উঠিল না। শেষে সকলের সাহায্যে যখন তাঁ'রা ছেঁড়া পোষাক ও ছেঁড়া গা নিয়া কোন রকমে বাহির হইয়া আসিলেন, তখন ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে

শিকারীরা বলিল—"হুজুর, দেখ্‌লেন তো জলের ঘোড়ার দল উঠে এসে আমাদের তাঁবু ছারখার করেছে, দু'টো চাকরকে মেরেছে—দু'টাকে জখম করেছে—শিকলি টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে বাচ্ছাকে নিয়ে চ'লে গেছে। ও বড় ভয়ানক জাত—রাগ্‌লে বাঘ সিঙ্গীর চেয়েও সাংঘাতিক হয়ে ওঠে।"

সাহেবেরা দেখিলেন কথাগুলো সমস্তই সত্য। তখনি হিপোগুলোর সন্ধান করিতে লোক পাঠাইয়া মরা চাকরদের কবর দিবার ও জখমী চাকরদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া তাঁবু ঠিক করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

[৫]

মাইল ছয়েক দূরে 'অরেঞ্জের' একটা খাড়ি বনের ভিতর ঢুকিয়া অনেকখানি যায়গা নিয়া একটা হ্রদের মতো হইয়াছিল। সেখানে স্রোত চলিত না বলিয়া এক রকম ঘাস ও বন-জঙ্গলে উহা যেমন ভরিয়া গিয়াছিল, তেমনি মশা, মস্ত মস্ত কুমীর, বিষে ভরা সাপ, আর কি যে কত ছিল বলা কঠিন।

সারাদিন খুঁজিয়া খুঁজিয়া সেইখানে হিপোর দল দেখিয়া সাহেবের লোকেরা যখন সন্ধ্যার মুখে খবর আনিয়া দিল, তখন পরদিন সকালেই সেইখানে যাইবার জন্য সাহেবেরা আয়োজন করিতে লাগিলেন।

সেই রকম অবস্থায় দরকার হইবে বলিয়া কর্ণেল সাহেব সেই অঞ্চলের 'ক্যানো' অর্থাৎ ডোঙ্গা সঙ্গে আনিতেও বাকী

রাখেন নাই। সকাল হইতেই কালো চাকরদের ভিতর হইতে বাছা বাছা জনকতক লোক চার পাঁচটা 'ক্যানো' লইয়া সেই হ্রদের দিকে চলিল। আর সাহেব শিকারী দু'জনকে পাঠাইয়া দিলেন—বনের ভিতর দিয়া—সেইখানে যাইবার জন্য।

সাহেবেরা যখন হ্রদের মুখে গিয়া পৌঁছিলেন, তখন সেখান হইতে 'হিপোর' চিহ্ন পর্য্যন্ত নজরে পড়িল না। হ্রদটা ছিল মস্ত বড়, কাজেই ক্যানোগুলোকে ভাসাইয়া হ্রদের সকল দিকে খুঁজিতে হুকুম দিয়া নিজেরাও দুই দিক ধরিয়া চলিলেন।

হঠাৎ অনতিদূরে একটা হিপোকে অল্প ভাসিতে দেখিয়া সাহেব যেমন গুলি করিলেন অমনি এক ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। চোখের পলকে জল তোলপাড় করিয়া অনেকগুলি কালো কালো মাথা ভুস্-ভুস্ করিয়া জলের ভিতর হইতে জাগিয়া উঠিল।

হিপোগুলো প্রায় সকল ক্যানোগুলিকেই ঘিরিয়া ফেলিল। সাহেবের চাকরেরা অস্ত্র মারিলে কি হইবে, হিপোগুলো তা' গ্রাহ্যই করিল না, গুঁতা মারিয়া, কামড়াইয়া ক্যানোগুলোকে উল্‌টাইয়া দিতে লাগিল। মানুষগুলো সাঁতরাইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল বটে, কিন্তু হিপোগুলো রাক্ষুসে হাঁ মেলিয়া তাহাদিগকে গিলিতে ছুটিল। হ্রদের বুকে প্রলয়ের অভিনয় সুরু হইল।

সাহেব দু'জন গুলির উপর গুলি করিয়া দু'একটাকে মারিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু ফল তেমন হইল না। গুলির আচ পাইতেই তাহারা জলে ডুবিয়া ক্ষণপরেই আবার ভাসিয়া তাড়া করিতে লাগিল। কাপ্তেন, বাধ্য হইয়া, লুকাইলেন।

ওদিকে শিকারী দু'জনও ততক্ষণ হ্রদের তীরে গিয়া সাহেবের দিকে চাহিয়াই চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—"পিছনে—পিছনে—সাবধান!"

কিন্তু সাহেব পিছন ফিরিতে না ফিরিতেই আচম্বিতে সেই দিক হইতে একটা প্রকাণ্ড হিপো উঠিয়া মাথার ধাক্কায় তাঁহার ক্যানোটাকে উল্‌টাইয়া দিল। আচম্বিতে জলে পড়িয়া যাওয়ায় তাঁহাদের হাত হইতে বন্দুক ও পড়িয়া গেল। তখন কোন রকমে তীরে উঠিয়া পলাইয়া যাওয়া ভিন্ন আর উপায় রহিল না। তাঁহারা সেই চেষ্টায়ই মন দিলেন। উপর হইতে শিকারী দু'জন গুলি ছুঁড়িয়া হিপোগুলোকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বিস্তর পরিশ্রমের পর শিকারীদের চেষ্টা সফল হইল বটে, কিন্তু তীরে উঠিবার ঠিক আগেই একটা হিপো হঠাৎ ভুস্ করিয়া মাথা জাগাইয়া কর্ণেল সাহেবের বা হাতের প্রায় অর্দ্ধেকটা কাটিয়া লইল।

কর্ণেল সাহেবকে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় তাঁবুতে ফিরাইয়া আনা হইল। বুনো লতাপাতার ঔষধে তখনকার মতো উপকার হইল বটে, কিন্তু তিনি যাতনায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। কাজেই, সেই পর্য্যন্ত শিকারের সখে জলাঞ্জলি দিয়া তিনি অতি কষ্টে কোন রকম করিয়া প্রাণটুকু বাচাইয়া সহরে ফিরিয়া আসিলেন।

তারপর? যা হইয়া থাকে—প্রায় বছরখানেকের জন্য তাঁহাকে হাঁসপাতালে বিছানা লইতে হইল।

পশুর প্রতিদান

[১]

আমেরিকার 'ইদাহো' অঞ্চলের বনে 'বুসি' আর 'ডিকি' —দুই বন্ধু—জানোয়ার মারিয়া তাহাদের চামড়া ও লোম সংগ্রহ করিয়া কারবার করিত। সেই জন্য প্রায় অনেক সময় বনের মধ্যে থাকিতে হইত বলিয়া তাহারা সেইখানে একখানা ঘর করিয়া লইয়াছিল।

প্রায় দু'দিনের পথ দূরে ছোট একটি রেল-ষ্টেশন। সেখানে জনকতক মানুষের বসতি লইয়া ছোটখাট একটা হাট-বাজার। পালাক্রমে মাসে একবার করিয়া এক-একজন গিয়া সেখান হইতে দরকারী জিনিস-পত্র আনিত।

কারবারে রোজগার হইত মন্দ নয়। সে অঞ্চলে কটা-লাল রংয়ের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এক রকম ভালুক মিলিত, তার নাম 'গ্রিজ্‌লি'। সেই গ্রিজ্‌লি ভালুকের বড় বড় ঘন লোমওয়ালা চামড়া খুব বেশী দরে বিকাইত।

বড় বড় জানোয়ার ধরিবার জন্য কলের এক রকম ফাঁদ ছিল। তা'তে একবার পা পড়িলে অমনি ঝনাৎ করিয়া লোহার শক্ত শক্ত তীক্ষ্ণ দাঁতওয়ালা দু'টো বেড়ী—দু'দিক হইতে আসিয়া—এমনভাবে পা চাপিয়া ধরিত যে, জানোয়ারতো আর নড়িতে চড়িতে পারিতই না—একেবারে মরিয়া যাইত।

সেই রকম গোটাকতক কলের ফাঁদ বনের নানা যায়গায় বসাইয়া দু'জনে চলিয়া আসিত, তারপর সপ্তাহে দুইবার গিয়া তাহার ভিতর হইতে নানা রকমের মৃত জানোয়ার বাহির করিয়া আনিত।

কিন্তু সে বছর তেমন সুবিধা হয় নাই বলিয়া দু'জনে দুঃখ করিতে করিতে এক দিন ফাঁদগুলো তদারক করিতে যাইতেছিল, হঠাৎ বুসি বলিয়া উঠিল—"ছ্যাখ্, ছ্যাখ্ ও কি?"

ডিকি ভাল করিয়া দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"তাই তো, প্রকাণ্ড গ্রিজ্‌লির পায়ের দাগ যে! এত বড় ভালুক তো এ অঞ্চলে দেখা যায় নি?"

[২]

দু'জনে ফূরতি করিয়া তাড়াতাড়ি বড় ফাঁদটার কাছে গিয়া দেখিল যে, সত্যই একটা প্রকাণ্ড গ্রিজ্‌লি, ফাঁদে পা আট্‌কাইয়া মরিয়া পড়িয়া আছে। সেটা মেয়ে গ্রিজ্‌লি, আর তার কোলের ভিতরে গোল হইয়া শুইয়া আছে—বড় বিড়াল ছানার মতো—তার একটা ছোট বাচ্ছা।

সেটা গর্জ্জিয়া উঠিল বটে, কিন্তু ডিকি তা'কে ধরিয়া বাঁধিল। তারপর দু'জনে মরা ভালুকটাকে বাহির করিতে গিয়া আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে, তাহার সারা গায়ের চামড়া কে যেন চিরিয়া শত টুকরা করিয়া রাখিয়াছে। কাজেই ভালুকটাকে ফেলিয়া দিয়া দু'জনে বাচ্ছাটাকে লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল।

বুসি বলিল—"বাচ্ছাটাকে রে'খে কাজ নেই, শেষ ক'রে দাও, ওর মা মরেছে বটে, কিন্তু ওর বাপ নিশ্চয় এখানে আছে।"

"ভালই তো—তারও ওই দশা হবে।"—বলিয়া ডিকি হাসিল। কিন্তু বুসি গম্ভীর ভাবে বলিল—"না, রকম দে'খে বোধ হচ্ছে সে ঘা-খেকো, কিছুতেই ফাঁদে পড়্‌বে না। নিশ্চয় আর কোথাও থেকে এই রকম ঘা খে'য়ে সে এ বনে পালিয়ে এসেছে। নইলে, অত বড় পায়ের দাগ আর কখনো এ বনে দেখিনি, তা' ছাড়া মরা ভালুকটাকে অমন ক'রে চি'রে, তার চামড়াখানা নষ্ট ক'রে যাবেই বা কে? তা'কে ফাঁদ থেকে ছাড়াতে না পেরে, রাগে ব্যাটা আমাদের রোজগারের দফা শেষ ক'রে রে'খে গেছে—সে শয়তান শিকারীদের মতলব জানে।"

ডিকি ঠাট্টা করিয়া বলিল—"তুমি হাসালে ভাই, ভালুকের কি মানুষের মত মগজ আর বুদ্ধি আছে যে আমাদের মতলব জানবে?"

তুমি এতকাল এ কাজ করেও এই গ্রিজ্‌লি জাতটাকে চিন্‌লে না? তা'দের মানুষের মগজ আর বুদ্ধির দরকার হয় না—এ ঈশ্বর দত্ত—পশুদের স্বাভাবিক বুদ্ধি ও ধারণা।

"আচ্ছা, দেখাই যাক্।" বলিয়া ডিকি ছেলের মতো আদর যত্নে ভালুকের বাচ্ছাটাকে পুষিতে আরম্ভ করিল, আর সেই সময় হইতে প্রায়ই এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতে লাগিল।

[৩]

দিন চারেক পরে দু'জনে ফাঁদ তদারক করিতে গিয়া পথে তেমনি ভালুকের পায়ের বড় বড় দাগ দেখিল বটে, কিন্তু বড় ফাঁদটা খালি দেখিয়া নিরাশ হইয়া পড়িল। তারপর অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে, অন্য ফাঁদগুলোতে অন্য যে সব জানোয়ার পড়িয়াছিল, সকলগুলোরই চামড়া একেবারে টুক্‌রা টুক্‌রা।

উপরি উপরি তেমনি ঘটিতে লাগিল। বুসি বিরক্ত হইয়া বলিল—"ব্যাপার দেখ্‌ছো তো। এখনো বাচ্ছাটাকে মেরে ফেলো—নইলে আমাদের এখান থেকে জাল গুটোতে হবে।"

ডিকি বলিল—"বটে, যে ছেলের মতো একদণ্ড কাছছাড়া থাকে না তা'কেও মার্‌তে হবে? তার চেয়ে এ কারবার তুলে দিয়ে, ওকে সহরে নিয়ে গিয়ে খেলা দেখিয়ে ঢের রোজগার কর্‌তে পার্‌বো।"

বাস্তবিকই বাচ্ছাটা প্রথম প্রথম চীৎকার করিয়া অস্থির করিত বটে, কিন্তু দুধ গরম করিয়া ডিকি যখন তা'র মুখের কাছে ধরিত, তখন সে সবটুকু খাইয়া বেশ ঠাণ্ডা হইত। তারপর ডিকি যখন তা'কে কোলের ভিতরে লইয়া শুইত তখন সে পরম আরামে নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া পড়িত।

এমনি করিয়া দিনের পর দিন বাচ্ছাটা যতই বাড়িতে লাগিল, ততই সে ডিকির এমন গা-ঘেঁষা হইয়া উঠিল যে, এক মিনিটের জন্যও তা'কে তফাতে রাখা ভার হইল। বুসি হাসিয়া বলিল—"ও

তোমাকে এখন ভালবাসে বটে, কিন্তু বড় হ'য়ে যখন জংলা স্বভাব ফি'রে পাবে তখন তোমার রক্ষা থাক্‌বে না। এখনো ওটাকে শেষ করে দাও।"

ডিকি জবাব না করিয়া যেমন দু'হাত বাড়াইল, অমনি ভালুকের বাচ্ছাটাও তা'র গা বাহিয়া কোলে উঠিয়া কাঁধে থাবা রাখিয়া তা'র মুখের পানে চাহিতে লাগিল। ডিকি আদর করিয়া তা'র মুখে চুমো খাইল। সে অমনি আহ্লাদে গলিয়া ডিকির মুখ চাটিতে লাগিল।

এমনি করিয়া যখন মানুষ ও বনের পশুর মধ্যে ভালবাসার বাঁধন শক্ত হইয়া উঠিতেছিল, তেমনি দিনে এক সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিবার সময় দু'বন্ধু আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে,একটা উচু ঝাঁকড়া গাছের দিকে চাহিয়া বাচ্ছাটা কেবল চাপা গর্জ্জন করিতেছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। কোথাও কিছু দেখিতে না পাইয়া ডিকি বন্দুকের একটা ফাকা আওয়াজ করিল। সঙ্গে সঙ্গে গাছটা বিষম নড়িয়া উঠিল, আর একটা প্রকাণ্ড জানোয়ার চোখের পলকে নামিয়াই বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

[৪]

দু'দিন পরে গভীর রাত্রে কি এক রকম ভীষণ শব্দে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া দু'জনেই আশ্চর্য্য হইয়া শুনিল—ঘরের একটা দিকের বেড়া বাহির হইতে কে যেন ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে। তাড়াতাড়ি দু'জনে বন্দুক লইয়া বাহির হইল বটে, কিন্তু কোথাও

কিছু দেখিতে পাইল না। বাচ্ছাটাও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া আসিয়া চুপ করিল।

সকালে কিন্তু দু'জনেরই নজরে পড়িল—একটা কোণের বেড়া এমনভাবে ভাঙ্গা যে, আর একটু হইলেই ফাঁক হইয়া যাইত। দু'জনে তখনি বেড়াটা মেরামত করিল।

সপ্তাহখানেক পর একদিন বনে যাইবার সময় দু'জনে তাড়াতাড়িতে ঘরের দরজাটা কতকগুলো তার দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া গেল। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া অবাক্ হইয়া দেখিল যে, সেই তারের বাঁধন কুটি-কুটি করিয়া কাটিয়া কে বা কাহারা ঘরে ঢুকিয়া শুধু যে জিনিসপত্র ভাঙ্গিয়া, ছড়াইয়া নাস্তানাবুদ করিয়াছে, এমন নয়, খাবার-দাবার সব শেষ করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

সেই দিন হইতে প্রায় প্রতিরাত্রেই ঘরের বাহিরে নানারকম শব্দ ও উৎপাত হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরে বাচ্ছাটাও অস্থির হইয়া এমন করিতে সুরু করিল যে, কারও আর ঘুমাইবার যো রহিল না। জ্বালাতন হইয়া বুসি বলিল—"কি আপদ জুটিয়েছ দেখ দেখি; বাইরে শয়তান গ্রিজ্‌লি ব্যাটা বাচ্ছাটার জন্য রে'গে হন্যে হ'য়ে কি উৎপাত কচ্ছে! দেনা ভাই—ওটাকে বাইরে বা'র করে—ব্যাটা ঠাণ্ডা হোক—নয় তো আপদ একেবারে চুকিয়ে দে।"

সে দিন ডিকি সত্যই বেজার হইয়া বাচ্ছাটাকে বাহির করিয়া দিয়া দোর বন্ধ করিল। কিন্তু সে তো দরজার নিকট হইতে নড়িলই না উপরন্তু দরজাটাতে আঁচড়-কামড় দিয়া এমনভাবে চেঁচাইয়া

কাঁদিতে সুরু করিল যে, আর থাকিতে না পারিয়া ঘণ্টা দুই পরে বুসি নিজে উঠিয়া গিয়া দোর খুলিয়া দিল।

বাচ্ছাটা অমনি চোখের পলকে ঘরে ঢুকিয়া ডিকির বিছানায় উঠিয়া তার গা চাটিতে সুরু করিল। ডিকি বলিল—"এখন যে তাড়ালেও যায় না, তার উপায় কি?"

বুসি হাসিয়া বলিল—"তুমি যে ওর মা, তা ভুল্‌ছো কেন? ও তোমায় ছেড়ে যেতে চায়না, বটে, কিন্তু বনে একেলা পেলে, সেইদিনই ওর বাপ ব্যাটা ওকে জোর করে টে'নে নিয়ে যাবে তখন রাখতে পার্‌বে না।

[৫]

দেখিতে দেখিতে ভালুকের বাচ্ছাটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইল। সেই সময় তা'দের পালা মতো বুসি জিনিষপত্র আনিবার জন্য একদিন বাজারে চলিয়া গেল। ডিকিও বাচ্ছাটাকে অতিকষ্টে ঘরের ভিতর বন্ধ করিয়া ফাঁদ তদারক করিতে বাহির হইল। বাচ্ছাটা চীৎকার করিয়া বন কাঁপাইতে লাগিল।

আন্দাজ মাইল দুই দূরে খানিকটা ফাকা যায়গার চারিদিক ঘিরিয়া ঘন ঝোপ-জঙ্গল ছিল। তারই একদিকে খানিকটা বন কাটিয়া দু'জনে বড় ফাঁদটা বসাইয়াছিল। ঘর হইতে মাইলখানেক যাইবার পরেই, সেইদিকে ভালুকের বড় বড় পায়ের দাগ দেখিয়া ডিকি আগে চলিল বড় ফাঁদটা দেখিতে।

কিছুদূর গেলেই হঠাৎ একটা উঁচু গাছের উপর হইতে মস্ত একটা কাঠ-বিড়ালী তা'কে দেখিয়া ভয়ানক চীৎকার জুড়িয়া

দিল। পাছে ভালুকটা ফাঁদে না ঢুকিয়া চলিয়া যায়, সেই জন্য ডিকি আর সে পথে না গিয়া ঝোপগুলো ঘুরিয়া চলিল—ফাঁদের ঠিক সাম্‌না সাম্‌নি—ঝোপের ভিতর দিয়া ঢুকিতে।

কিন্তু যেমন ঝোপ ঠেলিয়া ফাঁকা যায়গায় বাহির হইয়া ফাঁদের মুখের কাছে গিয়া পড়িল, অমনি সেই মুহূর্ত্তে পিছন হইতে হঠাৎ ভালুকের ভয়ানক গর্জ্জনে বন কাঁপিয়া উঠিল।

চকিতে পিছন ফিরিয়াই ডিকি সভয়ে দেখিল—এক প্রকাণ্ড গ্রিজ্‌লি—একেবারে যমের মতো—প্রায় তার গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। চোখের পলকে বন্দুক তুলিয়াই গুলি করিল—গুড়ুম!

গুলি ভালুকের চোখের ভিতর দিয়া গিয়া মাথা ফুঁড়িয়া বাহির হইল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেও একবার মরণকালের লাফ দিয়া বিষম জোরে ধপ্‌ করিয়া লুটাইয়া পড়িল প্রায় তার ডান্‌ পায়ের উপর।

ডিকি শশব্যস্তে পা খানা পিছনে সরাইয়া অজানতে ফেলিল বড় ফাঁদের উপরে। সঙ্গে-সঙ্গে ঝনাৎ করিয়া কলের দাঁতওয়ালা বেড়ী দু'টো আসিয়া সজোরে আঁটিয়া পড়িল পায়ের গাঁটের উপরে। ভীষণ যাতনায় বিকট চেঁচাইয়া ডিকিও সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পড়িয়া গেল।

মিনিট চার পাঁচ যে কেমন করিয়া কাটিল তা' তার জ্ঞানেই আসিল না। তারপর ডিকি যখন নিজের অবস্থা বুঝিল—তখন আর দাঁড়াইতে না পারিয়া বসিয়া বসিয়াই গুলি করিয়া কোনও মতে ফাঁদের স্প্রিং ভাঙ্গিয়া পাখানাকে বাহির করিয়া লইল।

[৬]

কলের দাঁতগুলো মাংস কাটিয়া পায়ের হাড় পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। ডিকি যখন সেগুলোকে টানিয়া বাহির করিল, তখন শুধুই যে রক্তের নদী বহিল এমন নয়, অসহ্য যাতনায় প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইল। ডিকি তাড়াতাড়ি গায়ের জামা ছিঁড়িয়া সেইখানে জড়াইযা বাঁধিল।

কিন্তু তারপর, মরা ভালুক ও ফাঁদটার অবস্থা দেখিবার জন্য যেমন দাঁড়াইতে যাইবে, অমনি অসহ্য যাতনায় তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল—চোখে সব অন্ধকার দেখিতে লাগিল—ধপ্ করিয়া ভালুকটার গায়ের উপরে পড়িয়া জ্ঞান হারাইল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে ঠাণ্ডা বাতাসে একটু আরাম পাইয়া ডিকি যখন চক্ষু মেলিল, তখন আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে, বিষম যাতনার সঙ্গে সঙ্গে তার পাখানাও বেজায় ফুলিয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ ডিকির মনে পড়িল যে, সেই ফাঁদেই মেয়ে ভালুকটা মরিয়াছিল আর কলের দাঁতগুলোতে তার রক্ত লাগিয়া শুকাইয়া গিয়াছিল। সেই রক্ত তার রক্তে মিশিয়া নিশ্চয়ই বিষের কাজ করিতেছে।

ক্রমে যাতনা এমন বাড়িল যে, ডিকি আর ঘা বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি খুলিয়া ফেলিয়া কোনও মতে অতিকষ্টে ঘরে ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু দোর খুলিতেই, ভালুকের বাচ্ছাটা তার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে আসিয়াও হঠাৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তার সারা গায়ের

লোম খাড়া হইয়া উঠিল। সে ডিকির দিকে চাহিয়া চাপা গর্জ্জন করিতে লাগিল।

ডিকি বুঝিল যে, তার আর রক্ষা নাই, তাই সেদিকে নজর না করিয়া অতি কষ্টে কোনও রকমে খানিকটা জল খাইয়া, বিছানায় উঠিয়া প্রায় অজ্ঞান হইয়া শুইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে বাচ্ছাটাও বিছানায় উঠিয়া তা'র পায়ের কাছে বসিয়া ঘা চাটিতে সুরু করিয়া দিল। ডিকির আর হাত তুলিয়া তাহাকে তাড়াইবার শক্তি পর্য্যন্ত ছিল না। ক্ষীণস্বরে দু'একবার বাচ্ছাটাকে ধম্‌কাইয়া তাড়াইবার চেষ্টা করিয়া যাতনায় আবার জ্ঞান হারাইল।

একরাত্রি ও একটা দিন যে কেমন করিয়া কাটিল, ডিকি তাহা জানিতেই পারিল না। তারপর হঠাৎ জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে অনেকটা আরাম বোধ করিল এবং আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে, ভালুকের বাচ্ছাটা তার পায়ের কাছে ঘুমাইতেছে।

সেই সময়ে বুসি ফিরিয়া আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া ভাবিল যে, বাচ্ছাটা বুঝি কামড়াইয়া ডিকিকে মারিয়া ফেলিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি বাচ্ছাটাকে গুলি করিবার জন্য বন্দুক তুলিল।

কিন্তু দেখিয়াই, ডিকি হাতের ইসারা করিয়া তাকে থামাইল। তারপরে কাছে বসাইয়া যখন সকল ঘটনার কথা বলিল, তখন বুসি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"এ্যাঁ, হিংস্রক জানোয়ারের প্রাণেও এমন ভালবাসা লুকানো থাকে!"